বাংলাদেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নয়ন ও কাঙ্খিত ফলাফল

অভিষ্ট লক্ষ্যঃ আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মানের Ready to Eat পর্যায়ের কৃষিজ খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পূরণপূর্বক ৬.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের খাদ্য সামগ্রী রপ্তানি এবং আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে এ খাতের রপ্তানি আয় ২৫.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণ।

বাস্তবায়ন কৌশলঃ

- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;
- ভূমির উৎপাদন সক্ষমতা ও জলজ পরিবেশ নিশ্চিতপূর্বক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের চাহিদা নির্ভর কৃষিজ পণ্য উৎপাদন এবং কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে সরবরাহ;
- প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিজ পণ্যের একক প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রি ও পোষ্ট হারভেষ্টিং পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন মাধ্যমে কাঁচামালের অপচয় রোধপূর্বক প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের কাঁচামালের সরবরাহ এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;
- খাদ্যের কাঁচামাল হিসেবে বিবিধ প্রাথমিক ও সেমি-প্রসেসড কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে Good Agriculture Preactice অনুসরণ, খাদ্যের বাংলাদেশ মান নির্ধারণ এবং নির্ধারিত মানের খাদ্য উৎপাদন ও বিপণন নিশ্চিত করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য মানের গ্রহনযোগ্যতা সৃষ্টিকরণ;
- কৃষি প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য শিল্প স্থাপন উৎসাহিত করার জন্য সহজ ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান, ট্যাক্স হলিডে ইত্যাদি বিবিধ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি;
- কৃষি প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য শিল্পের উন্নয়নে সরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সহায়ক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- দক্ষ জনবল তৈরী;
- সরকারি উপযুক্ত কোন সুনির্দিষ্ট সংস্থার প্রয়োজনীয় সক্ষমতা সৃষ্টিপূর্বক বিধি বিধানগত ভাবে খাদ্য শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য দায়িত্ব অর্পণ। উপরন্তু, কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজের অবস্থান তৈরি করতে পারলে, তাদেরকে উৎসাহ প্রদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- উদ্যমী বিপণন কার্যক্রম গ্রহণ।

বাংলাদেশের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পঃ

১.১ খাদ্যে প্রাচুর্য্য, ভূমির উর্বরতা, সহজলভ্য জীবন, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, নদী মেখলা অরণ্য-কান্তার বেষ্টিত প্রাকৃতিক আকর্ষণ ইত্যাদির জন্য অতীতে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ড ছিল স্বর্গতূল্য। খাদ্য প্রাচুর্য্য বিশেষ করে চাল ও মাছের জন্য এদেশ ছিল প্রসিদ্ধ। এদেশের গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ এবং গোয়াল ভরা গরুর গল্প আমরা সকলেই জানি। বিভিন্ন পর্যায়ে এদেশের কৃষির সাথে যুক্ত হয়েছে পাট, কার্পাস, রেশম, আগর, লাক্ষ্যা, আঁখ, ফলমূল ইত্যাদি অনেক কৃষিজ উপ-খাত। এসব কৃষি পণ্য নির্ভর শিল্প ছিল এ ভূখন্ডের গৌরব। পশু ও হাঁস-মুরগী পালন ছিল এ দেশের কৃষক পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংগ। ডাল, তৈল ও মসলা জাতীয় পণ্যেও ভরপুর ছিল এ ভূখন্ড। মোট কথা এ ভূখন্ড খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। তখনকার দিনে গ্রাম কেন্দ্রিক কৃষি পণ্য ও কৃষিজ শিল্প এ ভূখন্ডের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এ দেশের সুখ সম্পদের কারণে বার বার আমাদেরকে উপনিবেশিকদের শাসন শোষণের মধ্যে পড়তে হয়েছে এবং বার বারই আমাদের কৃষি ও কৃষিজ শিল্পের অগ্রযাত্রা বাঁধাগ্রস্থ হয়েছে। উনবিংশ শতকে প্যাকেজিং এ পাটের ব্যবহার, চা শিল্পের সূচনা, রাবার খাতের অন্তর্ভূক্তি ইত্যাদি এদেশের কৃষিজ শিল্পকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছে।

১.২ কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারিত একটি শিল্প খাত হচ্ছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প। নারী পুরুষের কর্মব্যস্ততা বিশ্ব ব্যাপি এখাতের উপযোগীতা বৃদ্ধি করে চলেছে। বিশ্ব বাণিজ্যে খাদ্য খাত শীঘ্রই শীর্ষ স্থান দখল করবে। বাংলাদেশেও এখাতের পরিধি সম্প্রসারিত হচ্ছে। খাদ্য খাতের সম্প্রসারণ অবস্থা বিবেচনা করে খাদ্যমান নির্ধারণ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো সৃষ্টি করা হচ্ছে। বাংলাদেশে খাদ্য খাতকে বিধি সংগতভাবে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। দেশে বিদ্যমান খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আইনে খাদ্য বলতে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য (যেমন খাদ্যশস্য, ডাল, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ডিম, ভোজ্যতৈল, ফলমূল, শাক-সব্জি ইত্যাদি) বা পেয় (সাধারণ পানি, বায়ুবাহিত পানি, অঙ্গারায়িত পানি, এনার্জী- ড্রিংক ইত্যাদি) সহ সকল প্রকার প্রক্রিয়াজাত, আংশিক প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত আহার্য্য উৎপাদন এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত উপকরণ বা কাঁচামাল যা মানব দেহের জন্য উপকারী আহার্য্য হিসেবে জীবন ধারণ, পুষ্টি সাধন ও স্বাস্থ্য রক্ষা করতে ব্যবহৃত সামগ্রীকে বুঝানো হয়েছে। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে তাই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সক্ষমতা ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপকতর হতে পারে।

১.৩ বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক খাদ্য পণ্য, Ready to Cook এবং Ready to Eat পর্যায়ের খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনে ছোট বড় অনেক শিল্প নিয়োজিত রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ শিল্প খাতের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষিজ খাদ্যের নতুন নতুন আইটেম তৈরি ও পরিবেশবান্ধব প্যাকেটজাত করে বিদেশে রপ্তানির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কৃষিজ খাদ্য রপ্তানি করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে উৎপাদিত শস্য ভিত্তিক খাদ্য, ফ্রোজেন ভেজিটেবল, ফলজাত সামগ্রী, মশলা, আলুজাত খাদ্য, ভেষজ সামগ্রী, চিনিজাত খাদ্য, মধু, মৎস্যজাত ও অপ্রচলিত মৎস্যজাতীয় খাদ্য, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুজাত খাদ্য, বোতলজাত পানি এবং লবণ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন হচ্ছে। কৃষি পণ্য হতে উৎপাদিত Ready to Cook এবং Ready to Eat পর্যায়ের খাদ্য সামগ্রীর তালিকা নিম্নরুপ:

সারণী-০১

খাদ্যের উপ-খাত	**এইচএস কোড চ্যাপ্টার**	**খাদ্য পণ্যাদি**
	উদ্ভিদজাত খাদ্য:	
শস্যজাত খাদ্য	১১ ও ১২	রুটি, বিস্কুট, নুডুলস, পাশতা, পরোটা, পাঁপড়, মাছ ও মাংসের তৈরি স্ন্যাক্স যেমন-হিমায়িত নাগেট, মিট বল, ফিস কেক, সিংগাড়া, সমুচা, সেমাই, ডালপুরী, পিঠা, মুড়ি, চিড়া, সুগন্ধি চাল, ডাল ভাজা, চানাচুর, মটরশুটি ভাজা, হালিম মিক্স, ইত্যাদি।
শাক-সব্জিজাত খাদ্য	০৭	হিমায়িত ও ক্যানজাত ভেজিটেবল।
ফলজাত খাদ্য	২০	জ্যাম, জেলি, আচার, ম্যাংগোবার, ফলের রস, সস, কেচাপ, ইত্যাদি।
আলুজাত খাদ্য	২০	চিপস, ক্র্যাকার্স, ফ্লেক্স, ষ্টার্চ, ফ্রেন্স ফ্রাই ইত্যাদি।
মাশরুম	০৭	তাজা বা পাউডার মাশরুম।
মসলা	০৯	আদা,হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, জিরা পিয়াজ,রসুন, তেজপাতা ইত্যাদি।
ডাল বীজ ও তৈল	০৭, ১৫	মটর শুটি, বিভিন্ন জাতের ডাল, সরিষা, তিল, তিসি, সূর্যমুখী, কুঁড়ার তৈল, ইত্যাদি।
চিনিজাত খাদ্য	১৭	খেজুর গুড়ের সিরাপ, চিনি, গুড়, ক্যান্ডি, ভিনেগার ইত্যাদি।
মধু	০৪	প্রক্রিয়াজাত মধু।
ভেজষ সামগ্রী	২১ ও ২২	ফুড সাপ্লিমেন্ট, ভিটামিন ইত্যাদি।
	মৎস্য ও প্রাণীজাত খাদ্য:	
মৎস্যজাত খাদ্য	০৩ ও ১৬	হিমায়িত চিংড়ি, শুটকি, ফিসফিলে, ফিসবল ইত্যাদি।
অপ্রচলিত জলজ খাদ্য	০৩, ০৬ ও ২২	শৈবালজাত পণ্য,কাঁকড়া, কুঁচে, শামুক-ঝিনুক, কুমির, কচ্ছপ ইত্যাদি নির্ভর অপ্রচলিত জলজ খাদ্য, লবণ, বোতলজাত পানি ইত্যাদি।
মাংসজাত খাদ্য	০২	হাঁস, মুরগি, গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার প্রক্রিয়াজাত মাংস, ভূঁড়ি, ফ্রোজেন সসেস, নাগেটস, কাবাব,মিটবল ইত্যাদি।
ডেইরী	০৪	পাস্তুরিত দুধ, গুড়া দুধ, আইসক্রীম, কনডেন্সড মিল্ক, ঘি,মাখন, মিষ্টি, পনির, চকলেট, দৈ, মাঠা ইত্যাদি।

২. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বর্ণনাঃ

২.১ বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর অবস্থা থেকে শিল্প, সেবা ও প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনৈতিক অবস্থানে রুপান্তরের কারণে মানুষের জীবনযাত্রায় চরম গতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে। যার কারণে মানুষ এখন প্রক্রিয়াজাত কৃষিজ খাদ্য সামগ্রীর দিকে ঝুঁকে পড়ছে। নারী ও পুরুষ উভয়ের পরিবারের বাইরের কর্মব্যস্ততা এ অবস্থাকে অধিকতর ত্বরান্বিত করছে। তবে বিবিধ নেতিবাচক প্রচারণা, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত মানের নিশ্চয়তার উপর ভোক্তার আস্থাহীনতা, মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের পণ্য মানের নিশ্চয়তা বিধানে সক্ষমতার অভাব ইত্যাদি বিষয় প্রক্রিয়াজাত খাদ্য শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। মানুষের চাহিদা সরকার ও উদ্যোক্তাবৃন্দকে অচিরেই প্রক্রিয়াজাত খাদ্য শিল্পের বিকাশে সুষ্ঠু অবস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম করবে। এছাড়া বর্তমান উন্নত বিশ্ব এমনকি উন্নয়নশীল দেশসমূহে Ready to Eat পর্যায়ের খাদ্যের চাহিদা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশি বেশ কিছু খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প নিজস্ব ব্রান্ডের কৃষিজ খাদ্য রপ্তানিতে সক্ষমতা অর্জন করেছে। এসব অবস্থা বাংলাদেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের যথাযথ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে যথাযথ মানের খাদ্য উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্য সামগ্রী বিপণনের সক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করবে।

২.২ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারী পর্যায়ের খাদ্য শিল্প বিদ্যমান। দেশে বৃহৎ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সংখ্যা খুবই কম। এছাড়া Ready to Eat পর্যায়ের চূড়ান্ত খাদ্য শিল্পের স্বল্পতাও এ শিল্প খাতের বর্তমান একটি বৈশিষ্ঠ্য। বাংলাদেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অধিকাংশই সেমিপ্রসেসড পর্যায়ের। দেশে এ কারণে উদ্যোক্তাবৃন্দের নিকট ইন্টারমিডিয়েটরী খাদ্য শিল্পই মূখ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে বিশ্ব ব্যাপি Ready to Eat পর্যায়ের খাদ্যের চাহিদা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশেও Ready to Eat পর্যায়ের খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ পর্যায়ে Ready to Eat পর্যায়ের খাদ্য প্রক্রিয়ারণ শিল্প সম্পসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের তালিকা নিম্নরূপ:

সারণী-০২

ক্র: নং	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিবরণ
০১.	ব্রেড, বিস্কুট, সেমাই, চানাচুর, নুডলস ইত্যাদি উৎপাদন শিল্প।
০২.	ময়দা এবং সুজি উৎপাদন শিল্প।
০৩.	চাল, মুড়ি, চিড়ে (popped rice), সুগন্ধিযুক্ত ও সাধারণ চাল ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প।
০৪.	সব্জি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প।
০৫.	ফল প্রক্রিয়াজাত শিল্প।
০৬.	মাশরুম এবং শৈবাল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প।
০৭.	বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ শিল্প।
০৮.	আলুজাত খাদ্য উৎপাদন শিল্প।
০৯.	স্টার্চ, গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ, এবং অন্যান্য স্টার্চ পণ্য উৎপাদন শিল্প।
১০.	মসলা উৎপাদন শিল্প।
১১.	ভেষজ সামগ্রী উৎপাদন শিল্প।
১২.	ভোজ্য তৈল পরিশোধন এবং হাইড্রোজেনেশন শিল্প।
১৩.	সরিষা তৈল উৎপাদন শিল্প।
১৪.	ভোজ্য তৈল (ধানের কুড়া থেকে তৈরি) উৎপাদন শিল্প।
১৫.	চা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প।
১৬.	মৌমাছি পালন ও মধু প্রক্রিয়াকরণ শিল্প।
১৭.	চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প।
১৮.	মাংস প্রক্রিয়াকরণ শিল্প।
১৯.	দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প।
২০.	পোল্ট্রি এবং গবাদি পশুজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প।
২১.	হাঁস, মুরগি, গবাদি পশু ও মাছ এর ফিড প্রস্তুতকারক ও হ্যাচারী শিল্প।
২২.	লবণ এবং বোতলজাত পানি শিল্প।
২৩.	প্যাকেজিং শিল্প, বরফ কল, স্বাস্থ্য সহায়ক প্রিজারভেটিভ প্রস্তুতকারক শিল্প।

২.৩ দেশে খাদ্যের সেমিপ্রসেসড এবং প্রসেসড শিল্পের হালনাগাদ মোট পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। তবে বিনিয়োগ বোর্ড, বিসিক এর তথ্যমতে দেশের সিংহভাগ শিল্পই ক্ষুদ্র ও মাঝারী।

৩. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সম্প্রসারণে বাংলাদেশের সক্ষমতাঃ

৩.১ কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশে খাদ্য শিল্পের বিকাশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। পর্যাপ্ত পরিমানে বিদ্যমান কাঁচামাল এ শিল্পে বাংলাদেশের মূল সক্ষমতা। দেশের এ সক্ষমতার কারণে বেশ কিছু বড় প্রতিষ্ঠান খাদ্য শিল্প সম্পসারণে কাজ করছে। মূল্য ও বিপণন নিশ্চিয়তা প্রদান সম্ভব হলে কৃষি প্রধান এ দেশে খাদ্য শিল্পের মূল কাঁচামাল কৃষি পণ্যের সম্প্রসারিত যোগান নিয়ে তেমন কোন সমস্যা হবে না। এছাড়া দেশে কৃষি খাতের সম্প্রসারণে সরকারি সহায়ক বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত নিবিড়ভাবে কাজ করছে। ফলাফলও অত্যন্ত ভাল। তবে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মূল দুর্বলতা মানসম্পন্ন প্রাথমিক কৃষি পণ্যের অভাব। বাংলাদেশে প্রাথমিক কৃষি পণ্যের মান নির্ধারিত নেই। দেশে কৃষি পণ্য উৎপাদনে Good Agriculture Practice অনুসরণ করা হচ্ছে না। সম্প্রতি কৃষি পণ্য উৎপাদনে কোডেক্স মান অনুসরণের জন্য জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। Good Agriculture Practice অনুসরণের জন্য বাংলা গ্যাপ প্রনয়নের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক কৃষি পণ্যের প্রি ও পোষ্ট হার্ভেষ্টিং পর্যায়ে প্রচুর দুর্বলতা বিদ্যমান যা এ শিল্পের মান ও মূল্যগত প্রতিযোগিতামূলক পণ্য উৎপাদনের অন্তরায়। সরকার এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনগত ভিত্তি সৃষ্টি করেছে এবং তা বাস্তবায়নে সহায়ক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিসহ এসব দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যতীত বেশ কিছু বৃহৎ এবং মাঝারী উদ্যোক্তা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগে এগিয়ে এসেছে। বর্তমানে দেশের পুঁজি বিনিয়োগ সক্ষমতাও যথেষ্ঠ। সরকার কর্তৃক বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিএসটিআই কর্তৃক অনেক খাদ্যের BDS Standard নির্ধারণ, সে অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন, বাজারজাত এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক মনিটরিং এর আওতায় নেয়া হচ্ছে। দেশে খাদ্যের নিরাপদ অবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। খাদ্য মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সম্মতভাবে উৎপাদন, যথাযথমানে সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে বিসিএসআইআর এর খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইএফএসটি) কর্তৃক কারিগরী ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। খাদ্য মান পরীক্ষণ এবং মান সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এ্যাক্রিডিটেশনের জন্য বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছে। ফাইটো-স্যানেটারী উইং, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগসহ পরীক্ষণ ল্যাবরেটরীসমূহের জনবল ও পরীক্ষণ যন্ত্রপাতির সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ চলমান। বাংলাদেশের অনুকূল বিনিয়োগ নীতি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঁজি সরবরাহে সক্ষমতা বিদ্যমান। ক্ষুদ্র আয়তনের বাংলাদেশে ভূমি এবং ইউটিলিটিসহ অবকাঠামোগত দুর্বলতা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক জোনিং প্রক্রিয়ায় এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রাইভেট ইকোনমিক জোন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সম্প্রসারণে সহায়ক হতে পারে। এছাড়া প্রায় প্রতিটি জেলায় বিসিক শিল্প এলাকা বিদ্যমান। এসব শিল্প এলাকায় প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি সুবিধাদি সম্প্রসারণ করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সম্প্রসারণের উপযোগী করা যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকার আইসিটি এবং কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সম্প্রসারণে ৩০০.০০ কোটি টাকার একটি ইকুইটি ইন্টারপ্রিনিয়ারশিপ তহবিল গঠন করে। এক্ষেত্রে কিছু এগ্রোবেইজড ইন্ডাষ্ট্রিজ গড়ে উঠলেও বেশ কিছু রুগ্ন শিল্পে পরিনত হয়েছে। এছাড়া অনেক উদ্যোক্তা এ তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ অনেক জটিল বলে মনে করে। এসব কারণে এ তহবিলে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে যে সুফল আশা করা হয়েছিল তা অর্জিত হয়নি। বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক উক্ত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প খাত উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশে সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ফুড টেকনোলজি বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরী করছে। এসব বিষয়াদি বিবেচনায় নেয়া হলে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বাংলাদেশের সক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। এসব বিষয়ে বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহের দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন। দীর্ঘ সূত্রিতার বেড়াজালে আটকে থাকলে সক্ষমতা অক্ষমতায় পর্যবসিত হতে পারে।

৩.২ খাদ্য শিল্পের প্রসারের সাথে বাণিজ্যের বিষয়টি বিশেষ ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ ক্ষেত্রে খাদ্যের নিরাপদ অবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্য বাণিজ্যকে বাঁধাহীন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া আবশ্যক, যাতে করে ভোক্তা পর্যায়ে আস্থা অর্জন সম্ভব হয়। এজন্য আন্তর্জাতিক মানসমূহের ভিত্তিতে খাদ্যের বাংলাদেশ মান প্রণয়ন করতে হবে। এ বিষয়টির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ষ্টান্ডার্ড এন্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউট কাজ করছে। কিন্তু বাংলাদেশে উৎপাদিত সকল খাদ্য পণ্যের বাংলাদেশ মান প্রণয়ন এখনও সম্ভব হয় নাই। বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে গ্রহণীয় পর্যায়ে খাদ্য মান প্রণয়ন এবং উক্ত মানে পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৩ বাংলাদেশে খাদ্য শিল্পের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড, বিসিক, বিএসটিআই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিসিএসআইআর-এর খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনষ্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, ডিপার্টমেন্ট অব লাইভ স্টক সার্ভিসেস, মৎস্য অধিদপ্তর, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ-বেশ কিছু মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি

সহায়ক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লেষ রয়েছে। প্রাথমিক কৃষি পণ্যের সার্বিক উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট সহায়ক প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। কিন্তু খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। বিনিয়োগ, অবকাঠামোগত সুবিধা, ইউটিলিটি সুবিধাদি, নিবন্ধিতকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কাঁচামালের যোগান সুনিশ্চিতকরণ, গবেষণা ও উন্নয়ন পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপরের প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করলেও এখাতে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান নেই, যা থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে বিসিএসআইআর এর খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনষ্টিটিউট-কে ফোকাল পয়েন্ট-এর দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পরে।

৩.৪ বিশ্বব্যাপী খাদ্যের বাজার সৃষ্টি হওয়ায় পণ্য মান ও মূল্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে খাদ্য গ্রহণে ধর্মীয় বিধিবিধান। বিশ্বব্যাপী হালাল খাদ্য সবার নিকট নিরাপদ হিসেবে ইতোমধ্যেই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এছাড়া বিশ্বের ২০০ কোটির অধিক মুসলমান হালাল খাদ্যের গ্রাহক। তাই হালাল খাদ্যের বাজার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু বাংলাদেশে হালাল সার্টিফিকেশনের সুদৃঢ় অবকাঠামো, আইনগত ভিত্তি এবং সার্টিফিকেশনের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ধর্ম মন্ত্রণালয় হালাল আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং একটি হালাল নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ চলমান, যা দ্রুত সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। সরকার ইসলামী ফাউন্ডেশনকে হালাল সনদ ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করছে। ইসলামী ফাউন্ডেশনে হালাল পণ্য এবং হালাল প্রক্রিয়া নির্ধারণ সম্পর্কিত দক্ষ জনবল বিদ্যমান থাকলেও মান সনদ সুবিধা নিশ্চিত করার মতো কিছুই নেই। হালাল খাদ্যের দুটি পর্যায়। একটি হচ্ছে হালালান এবং অপর অংশ তৈয়েবান। হালাল অংশে পণ্য এবং পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া অপরিহার্য। অপর অংশে পরিচ্ছন্নতা, যা পণ্য মান হিসেবে বিবেচিত। হালাল সামগ্রীর পরিধি ব্যাপক। বাংলাদেশে বিভিন্ন পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। এ পর্যায়ে হালাল পণ্যের মান সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য ইসলামীক ফাউন্ডেশন এবং মান পরীক্ষণ ল্যাবরেটরীসমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে তৈয়েবা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত চাহিদা পূরণ করা যায়। এছাড়া ওআইসি প্রণীত হালাল মান অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশি হালাল সনদের গ্রহণ যোগ্যতা সৃষ্টি করা যায়।

৪. বাংলাদেশী খাদ্য সামগ্রীর রপ্তানি অবস্থাঃ

৪.১ বাংলাদেশ হতে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের ১১৮টি দেশে এগ্রোপ্রসেসড পণ্য রপ্তানি করা হচ্ছে। কিছু প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ব্রান্ডের বিবিধ খাদ্য সামগ্রী রপ্তানি করছে। বর্তমানে বাংলাদেশী খাদ্য Ethnic বাজারের গন্ডি পেরিয়ে Up Stream মার্কেটে প্রবেশে সক্ষম হয়েছে। তবে এসব বাজারের অধিকাংশ মধ্যম ও নিম্ন আয়ের দেশ। দুই একটি প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে খাদ্য মান সচেতন উন্নত দেশে খাদ্য রপ্তানিতে সক্ষমতা অর্জনে এখনও সফলতা পাওয়া যায় নাই। মান ও মূল্যের বিচারে বাংলাদেশে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী এখনো প্রতিযোগিতামূলক নয়। এ অবস্থায় সরকার ৬৪টি প্রাথমিক ও এগ্রোপ্রসেসড পণ্যের রপ্তানি আয়ের বিপরীতে ২০% নগদ সহায়তা প্রদান করছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোন কম্পোজিট ফুড ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠে নাই। এছাড়া উৎপাদিত খাদ্যের পরিমান ও পরিধি খুবই অল্প। দেশে একক সার্টিফায়িং কর্তৃপক্ষ নেই। অথচ শ্রীলঙ্কা, সৌদি আরব, থাইল্যান্ড,সিংগাপুর ইত্যাদি অনেক দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ফুড এন্ড ড্রাগ অথরিটি সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে ঔষুধ ও খাদ্যের জন্য কমপক্ষে ৬টি প্রতিষ্ঠান সার্টিফায়িং অথরিটি হিসেবে কাজ করছে। তবে এগুলোর কোনটিই এ্যাকরিডিটেড নয় বিধায় এসব প্রতিষ্ঠানের সনদের গ্রহণ যোগ্যতা নেই। পরীক্ষণ ল্যাবরেটরিসমূহের জনবলগত ও মেশিনপত্র সংশ্লিষ্ট সক্ষমতাও দুর্বল। খাদ্য পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণেও দুর্বলতা বিদ্যমান। দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি খাদ্যের মান নিয়ে ব্যাপক নেগিটিভ প্রচারণা রয়েছে। তবে আসার কথা বাংলাদেশ সরকার খাদ্যের মান নিশ্চিতকরণে আইনি কাঠামো সৃষ্টিসহ বিবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় বাংলাদেশ খাদ্যের মানগত বিষয়ে অনুকূল ইমেজ অর্জনে সক্ষম হবে। বাংলাদেশি খাদ্যের প্রধান প্রধান আমদানিকারক দেশসমূহ হচ্ছে ইউএই, সৌদিআরব, ভারত, ইউএসএ, কানাডা, ইউকে, ভূটান, মালয়েশিয়া, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, কাতার, নেপাল, এ্যাঙ্গোলা, ডিজিবুটি, অষ্ট্রেলিয়া, বাহরাইন, ঘানা, সেনেগাল, গুয়েনাবিসু, সাউথ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, তাইওয়ান, কোরিয়া, স্পেন, হংকং, চীন, পাকিস্তান, মায়ানমার, মরিশাস, মালদ্বীপ, লাইবেরিয়া ইত্যাদি।

৫. খাদ্যসামগ্রীর বিশ্ব বাজারঃ

৫.১ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, খাদ্যাভাস পরিবর্তন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে নারীর ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ততার কারণে বিশ্বে Ready to Cook এবং Ready to Eat পর্যায়ের খাদ্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় এমন ধরণের পণ্যের বিশ্ব বাজার ছিল ৫৯৭.৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও অধিক।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ক্রেতার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও অল্প সময়ে রান্নার সুবিধার কারণে এসব পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইউএসএ এসব পণ্যের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। বিশ্ব বাজারের ৪০% দখল করে আছে ইউরোপীয় দেশসমূহ। এছাড়া দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা এবং এশিয়ার দেশসমূহও এসব পণ্যের সম্ভাবনাময় বাজার।

৫.২ এগ্রোপ্রসেসড পণ্যের প্রধান প্রধান আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক দেশ হচ্ছে- ইউএসএ, ইইউ, ইউকে, রাশিয়া, হংকং, চায়না, জাপান, সিঙ্গাপুর, ইউএই, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভেনিজুয়েলা, কোরিয়া, চীন, ইটালি, স্পেন, পর্তুগাল, সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড,নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ব্রাজিল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, সৌদি আরব, তুরস্ক, ইরান, ইউএই, আফগানিস্থান, উজবেকিস্থান ইত্যাদি। বাংলাদেশের খাদ্য সামগ্রীর মোট রপ্তানি মোট আমদানির তুলনায় একেবারেই নগন্য। তাই বাংলাদেশ হতে খাদ্য সামগ্রী রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা অতি উজ্জল। ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ে বিশ্বে খাদ্যের মোট আমদানি এবং উক্ত ০৫ বছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি পরিমান নিম্নরুপ:

সারণী-০৩

মূল্য: মিলিয়ন মার্কিন ডলার

বছর	বিশ্ব আমদানি	বাংলাদেশের রপ্তানি
২০১১	৬৮৪৪২১	১৩৩৪.৬০
২০১২	৬৬৮০৯০	১০৭০.৮৯
২০১৩	৬৯৮৮১২	১১৫৫.৩
২০১৪	৭০২২৩৪	৯৫৩.৯৫
২০১৫	৫৯৭৯৮২	৭৫৯
মোট	৩৩৫১৫৩৯	৫২৭৩.৭৪

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং আইটিসি ট্রেড ম্যাপ

৫.৩ বাংলাদেশ থেকে খাদ্য সামগ্রীর রপ্তানি সম্ভাবনা নিম্নের তথ্য চিত্রে দেখানো হলোঃ

তথ্য চিত্র-০১

Value in million US$

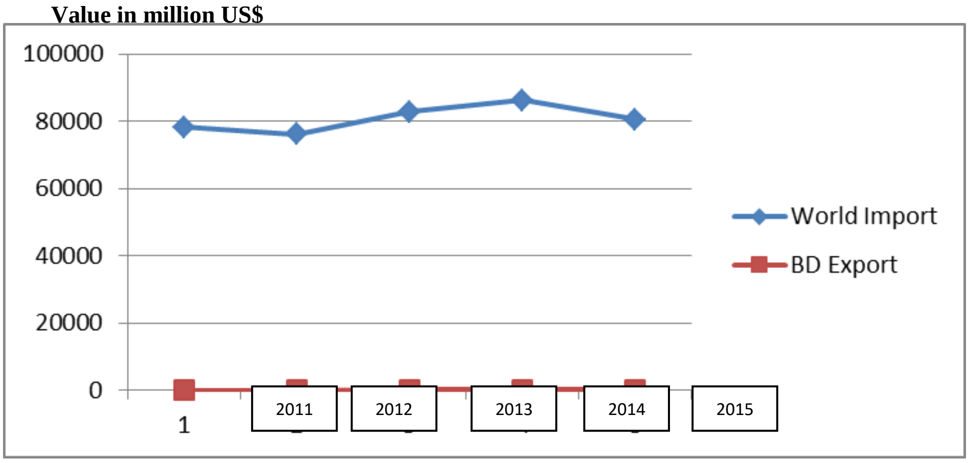

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং আইটিসি ট্রেড ম্যাপ

৫.৪ খাদ্য সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যেমন সুযোগ বিদ্যমান, অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণেও পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। এদেশের মানুষের খাদ্যাভাস এবং জীবন যাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে চাহিদাগত পরির্বতন আসছে। জীবিকার প্রয়োজনে নারী পুরুষ সকলেই পরিবারের বাইরের কর্মক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হচ্ছে। যার কারণে তৈরী খাবারের অভ্যন্তরীণ বাজারও সম্প্রসারিত হচ্ছে। খাদ্য সামগ্রীর বাজার পরিধির বিবেচনায় বাংলাদেশে খাদ্য শিল্প সম্প্রসারণের ব্যাপক সম্ভাবনা বিদ্যমান।

৬. **উদ্ভিদজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ব্যবহৃত প্রাথমিক পণ্যাদির উপ-খাতভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণন অবস্থাঃ** খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের পশ্চাৎ সংযোগ পণ্য হিসেবে উদ্ভিদজাত প্রাথমিক পণ্য এবং সেমি-প্রসেসড্ পণ্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কৃষি উপযোগী দেশ হওয়ায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিদজাত প্রাথমিক পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়। চাহিদা অনুযায়ী যাবতীয় উদ্ভিদজাত কৃষি পণ্যের উৎপাদন সম্প্রসারণ সক্ষমতা বাংলাদেশের রয়েছে। এসব প্রাথমিক পণ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। আবার কিছু পণ্য সেমি-প্রসেসড্ পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণের পর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পসমূহে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের ভূমি, জলবায়ু ইত্যাদি কৃষির জন্য অত্যন্ত উপযোগী হওয়ায় যুগযুগ ধরে কৃষি এদেশের জীবনী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এক সময় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণরূপে জৈব। তখন অজৈব সার ও কীটনাশক এর ব্যবহার ছিল না। প্রাকৃতিক দূর্যোগ, অসচেতনতা, অনুন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ইত্যাদি কারণে এদেশে কোন কোন সময় ভয়ানক খাদ্য ঘাটতি হলেও এদেশের কৃষি খাত জৈব উৎপাদন ব্যবস্থায় খাদ্য চাহিদা পূরণে সক্ষম ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বহুজাতিক কোম্পানীসমূহের তৎপরতা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে বাংলাদেশের সার্বিক কৃষি ব্যবস্থা অজৈব সার ও কীটনশক নির্ভর হয়ে পড়েছে। যার কারণে ভূমির উর্বরতা হ্রাস, মাটির কঠিনত্ব বৃদ্ধির ফল হিসেবে অনুজীবের ধ্বংস সাধন, অত্যধিক/মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে রোগ-বালাই দমনে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ প্রবর্তন হওয়ায় কৃষির জৈব উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতের ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বিষয়টি এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, উচ্চ ফলনের প্রয়োজনে কৃষির অজৈব উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় কৃষক যেতে বাধ্য হচ্ছে যা কৃষি ব্যবস্থাপনার প্রাকৃতিক উপায়সমূহ ধংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প দূষণের ফলে কৃষি জমিতে হেভী মেটালের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্যিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্জ্য শোধনের ব্যবস্থা না রেখে অধিক মুনাফা অর্জনে মনোযোগী। পরিবেশের ক্ষতির বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে। এটি দেশে কৃষি ব্যবস্থাপনায় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব, স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকবৃন্দের অসচেতনতা ইত্যাদি কারণে শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ঢালাওভাবে এসব ক্ষতিকর সামগ্রীর ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে এ অবস্থা থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের তুলনায় বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি উৎপাদনের পরিমান কম হওয়ায় অনেক কৃষি পণ্যের মূল্য প্রতিযোগিতামূলক নয়। এ পর্যায়ে কৃষি ব্যবস্থপনায় রোগ বালাই দমনের জন্য Genetically Modification Organigom প্রযুক্তির ব্যবহার শুরুর চিন্তা করা হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্ব দুই ভাগে ভাগ হয়ে এ ব্যবস্থাপনার পক্ষে ও বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোসহ বেশকিছু উন্নত দেশ খাদ্য সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে জৈব ব্যবস্থাপনায় উৎপাদিত কৃষি পণ্যের উৎপাদন উপকরণ ব্যবহারের সীমারেখা আরোপ করছে। উক্ত সীমারেখার মধ্যেই নীরোগ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যসামগ্রী নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এসব দেশে Genetically Modified Organism (GMO) এবং Living Modified Organism (LMO) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কীটনাশক উৎপাদক কোম্পানিসমূহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে রিপ্রেজিনটিটিভ নিয়োগ, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রদান ইত্যাদি বিপণন উন্নয়ন কৌশল ব্যবহার করে কীটনাশকের বিক্রয় বৃদ্ধি করছে যা মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধিসহ পরিবেশের ভয়ানক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

অভ্যন্তরীণ বাজারে নিরাপদ পরিবহন ও সংরক্ষণ সুবিধা না থাকায় পঁচনশীল কৃষি সামগ্রীর অপচয়ের পরিমান অনেক বেশি যা মূল্য প্রতিযোগিতার ক্ষমতা হ্রাসের কারণ। এছাড়া খাদ্যসহ কৃষি সামগ্রীর সতেজতার স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে ক্ষতিকারক প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হচ্ছে যা দেশের মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করছে। কৃষকগণকে উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে নিরাপদ মানে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবহন বিষয়ে প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে না। যার কারণে কৃষকগণ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। সরকার কর্তৃক খাদ্যসহ শাক-সজি ও ফলমূলের রপ্তানি আয়ের বিপরীতে ২০% নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে যা রপ্তানি মূল্যকে প্রতিযোগিতামূলক করার ক্ষেত্রে সহায়তা করছে। তবে কৃষি খাতের মৌলিক সমস্যাদির কোনরূপ সমাধান হচ্ছে না। এমনকি কৃষি খাতের মৌলিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে তাজা শাক-সজির রপ্তানি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে। এ সত্বেও রপ্তানিকারকবৃন্দ সরাসরি বাজার থেকে শাক-সজি ক্রয় করে রপ্তানি করছে। বর্তমানে রপ্তানি পণ্যের মূল্য প্রতিযোগিতামূলক করার চেয়েও আমদানিকরাক দেশসমূহের আমদানি নিষেধাজ্ঞা এড়ানো মুখ্য কাজ হয়ে পড়েছে। খাদ্যের কাঁচামাল তাজা শাক-সজিসহ অন্যান্য খাদ্য উপাদানের মান ঠিক না থাকলে উৎপাদিত খাদ্যের মান নিশ্চিত সম্ভব নয়। এ পর্যায়ে খাদ্য শিল্পের সম্প্রসারণ এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য বিপণনে চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থায় Good Agriculture Practice অনুসরণপূর্বক তাজা শাক-সজি, ফলমূল ও অন্যান্য খাদ্য উপকরণ উৎপাদন আবশ্যক। উদ্ভিদজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উপ-খাত ভিত্তিক প্রাথমিক পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন অবস্থা, সমস্যা এবং করণীয় বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

৬.১ শস্যজাত প্রাথমিক পণ্যঃ অনুকূল জলবায়ু ও উর্বর মাটির কারণে বাংলাদেশ বছরের সবসময়ে বিভিন্ন ধরণের শস্য উৎপাদনে উপযোগী। ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি এদেশের শস্যজাত অন্যতম প্রাথমিক কৃষি পণ্যাদি। খাদ্য শস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এটি মূলত: ধান ও ভুট্টার জন্য প্রযোজ্য। বাংলাদেশে এখনও গমের ঘাটতি রয়েছে যা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। বিগত ৬ অর্থবছরে আউশ, আমন, বোরো, গম, ভুট্টা ইত্যাদি খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

সারণী-০৪

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
আউশ	১৭.০৯	২১.৩৩	২৩.৩২	২১.৫৮	২৩.২৬	২৩.২৮
আমন	১২২.০৭	১২৭.৯১	১২৭.৯৮	১২৮.৯৭	১৩০.২৩	১৩১.৯০
বোরো	১৮৩.৪১	১৮৬.১৭	১৮৭.৫৯	১৮৭.৭৮	১৯০.০৭	১৮৯.৭৭
মোট ধান	৩২২.৫৭	৩৩৫.৪১	৩৩৮.৮৯	৩৩৮.১৪	৩৪৩.৫৬	৩৪৪.৯৫
গম	৯.৬৯	৯.৭২	৯.৯৫	১২.৫৫	১৩.০২	১৩.৩৩
ভুট্টা	৮.৮৭	১৫.৫২	১২.৯৮	২১.৭৮	২৫.১৬	২৫.১১
মোট	**৩৪১.১৩**	**৩৬০.৬৫**	**৩৬১.৮২**	**৩৭২.৬৬**	**৩৮১.৭৪**	**৩৮৩.৪৯**

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫

বর্তমানে বাংলাদেশ শস্যজাত প্রাথমিক পণ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এদেশের মানুষের খাদ্যাভাসের পরিবর্তন আসছে যা শস্যজাত প্রাথমিক পণ্যের উদ্বৃত্ত অবস্থা সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। এ ব্যতীত কৃষকবৃন্দ পণ্যের মূল্য এবং বাজারের নিশ্চয়তা পেলে এর উৎপাদন বহুগুনে বৃদ্ধি করতে সক্ষম। সরকার গবেষণা উন্নয়ন কাজে পর্যাপ্ত পরিমানে সহায়তা করছে। এদেশে বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে অনেক সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। শস্যজাত প্রাথমিক পণ্যে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক এর ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম। তবে শিল্প বর্জ্যের কারণে অনেক এলাকায় হেভি মেটাল-এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে যা এ পণ্যের মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করছে। সার্বিক বিবেচনায় শস্যজাত প্রাথমিক পণ্যের সম্প্রসারণ সম্ভাবনা বেশ ব্যাপক।

৬.১.১ শস্যজাত প্রাথমিক পণ্যের সমস্যাঃ

১. বাংলাদেশের কৃষকগণ নিজ চাহিদা সামনে রেখে কৃষি পণ্য উৎপাদন করে থাকে। বাণিজ্যিক লাভ-ক্ষতির বিষয় বিবেচনায় না নেয়ায় বাণিজ্যিকভাবে উপযোগী শস্যজাত প্রাথমিক পণ্যের উৎপাদনের পরিবর্তে গতানুগতিক পণ্য উৎপাদন;

২. মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার, যথেচ্ছা শিল্প বর্জ্য পরিত্যাগ ইত্যাদি কারণে জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস, অনুজীবের অনুপস্থিতি, কৃষি জমিতে হেভী মেটালের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয় শস্যজাত প্রাথমিক পণ্যের উন্নত মান নিশ্চিতের ক্ষেত্রে অন্তরায়, যা খাদ্য মান নিশ্চিতের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে;

৩. কৃষকদের অজ্ঞতার কারণে গুনগত মানের বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে শুধুমাত্র ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার বৃদ্ধি;

৪. ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ও বিপণন উন্নয়নের ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকায় এসব ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যের বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিপণন উন্নয়নের বিভিন্ন অপতৎপরতা; এবং

৫. মান সম্পন্ন কৃষি পণ্য উৎপাদন, ফসল কর্তন/সংগ্রহ, পরিবহণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কৃষকবৃন্দের কারিগরী জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা।

করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় /প্রতিষ্ঠান
১.	লাভ ক্ষতি বিবেচনায় নিয়ে কৃষক/উৎপাদকবৃন্দকে শস্যাদি উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরণ;	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও শস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান
২.	শস্যাদি উৎপাদনে ব্যবহৃত বীজের উন্নত মান নিশ্চিতকরণ;	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, শস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান
৩.	স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কীটনাশক উৎপাদন, আমদানি ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ; এবং	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সিসিআইএন্ডই
৪.	রাসায়নিক সার-কীটনাশক-এর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বিপণন প্রতিনিধি বা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারণাপূর্বক বিপণন উন্নয়ন পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধকরণ; এবং	কৃষি মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	এগ্রো-প্রসেসড শস্যজাত খাদ্য পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত শস্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে গবেষণা জোরদারকরণ ও প্রয়োগ উৎসাহিতকরণ;	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
২.	শস্য উৎপাদনে Good Agricultural Practice অনুসরণ;	কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

৩.	আন্তর্জাতিক বাজারে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমানে রপ্তানির বিপরীতে প্রদানকৃত নগদ সহায়তার সমপরিমান অর্থ চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ ব্যবস্থায় রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে জড়িত কৃষকবৃন্দকে কারিগরি সহায়তাসহ যথাযথ মানের বীজ, সার, কীটনাশক ও অন্যান্য উপকরণ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য সহায়তা হিসেবে প্রদান;	কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৪.	শস্যজাত পণ্য উৎপাদনে চুক্তিবদ্ধ কৃষককে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর তরফ থেকে কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীর সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর তরফ থেকে মনিটরিং-এর ব্যবস্থাকরণ;	কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৫.	উৎপাদক ও বিপণন প্রতিষ্ঠানের হাতে (রাসায়নিক সার ও কীটনাশক)-এর বিপণন ব্যবস্থা না রেখে সরকারের কৃষি বিভাগের নিয়ন্ত্রণে বিকল্প বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ক্ষতিকারক এসব সামগ্রী ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং-এর ব্যবস্থাকরণ।	কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৬.	কীট পতঙ্গ দমনে প্রাকৃতিক ব্যবস্থাদির উন্নয়নে গবেষণা জোরদারকরণ ও প্রয়োগ উৎসাহিতকরণ।	কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

১.	পলিথিনের যথেচ্ছা ব্যবহার ও শিল্প পণ্যের যথেচ্ছা পরিত্যাগ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে ভূমি দূষণ রোধকরণ;	শিল্প মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়
২.	সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আর এন্ড ডি কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মান সম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতের শস্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ; এবং	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি মন্ত্রণালয়
৩.	কোডেক্স মান অনুসারে শস্যের মান নির্ধারণ।	বিএসটিআই ও শিল্প মন্ত্রণালয়

৬.২ শাক-সব্জিঃ উদ্যানজাত খাদ্য শাক-সব্জি তাজা এবং প্রক্রিয়াজাত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। এদেশে ১০০-এর অধিক জাতের শাক-সব্জি পাওয়া যায়। বাংলাদেশ বর্তমানে ১৪২ লক্ষ মেঃ টন তাজা শাক-সব্জি উৎপাদন করে থাকে। এদেশে বিগত ৫ বছরে শাক-সব্জি উৎপাদনে ব্যবহৃত জমির পরিমান এবং উৎপাদন ছিল নিম্নরূপঃ

সারণী-০৫

বৎসর	**আবাদী জমির পরিমান (লক্ষ হেঃ)**	**মোট উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)**
২০১০-১১	৭.২০	১১১.৯৪
২০১১-১২	৭.৪০	১২৫.৮০
২০১২-১৩	৭.৬৬	১৩২.২১
২০১৩-১৪	৭.৭০	১৩৯.১৯
২০১৪-১৫	৭.৯৮	১৪২.৩৭

উৎস: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

সালাদ, স্যুপ এবং সুষম খাদ্যের সহায়ক উপাদান হিসেবে শাক-সব্জি ব্যবহৃত হয়। এ ব্যতীত বাংলাদেশে শুধুমাত্র শাক-সব্জির তৈরি Ready to Eat পর্যায়ের খাদ্য প্রস্তুত হয় না। তবে শাক-সব্জি Ready to Eat পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণপূর্বক বিপণনের সুযোগ রয়েছে। হিমায়ন, শুষ্ককরণ, ধুমায়ন, ক্যানিং ইত্যাদি শাক-সব্জির Ready to Eat পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। Ready to Eat পর্যায়ে শাক-সব্জি রপ্তানির ক্ষেত্রে অপচয়ের পরিমান হ্রাস, পঁচনশীলতারোধ, দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ, পরিবহন ব্যয় হ্রাস, উচ্চ মূল্য প্রাপ্তি ইত্যাদি সুযোগ সৃষ্টি হবে। উল্লেখ্য, শাক-সব্জির অপচয় ৪৫% পর্যন্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ বাজারে শাক-সব্জি এখনও Ready to Eat পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণপূর্বক তেমন একটা বিপণন হচ্ছে না। তবে হিমায়িত আকারে কিছু শাক-সব্জি রপ্তানি হচ্ছে। জনবহুল বাংলাদেশের শাক-সব্জি শুষ্ককরণ এবং ক্যানিংপূর্বক রপ্তানির সুযোগ বিদ্যমান।

বিগত ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে তাজা ও হিমায়িত আকারে রপ্তানিকৃত শাক-সব্জির পরিমান যথাক্রমে ৭১.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৭৭.৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১১০.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৪৭.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১০৩.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে Ready to Eat পর্যায়ের শাক-সব্জির বিশ্ব বাণিজ্য ছিল যথাক্রমে ৬৪.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৬৪.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৭০.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৭২.২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৬৮.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিম্নে তথ্য চিত্রে বাংলাদেশ থেকে Ready to Eat পর্যায়ের শাক-সব্জির রপ্তানি এবং বিশ্ব আমদানির তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেখানো হলোঃ

তথ্য চিত্র-০২

Value in million US$

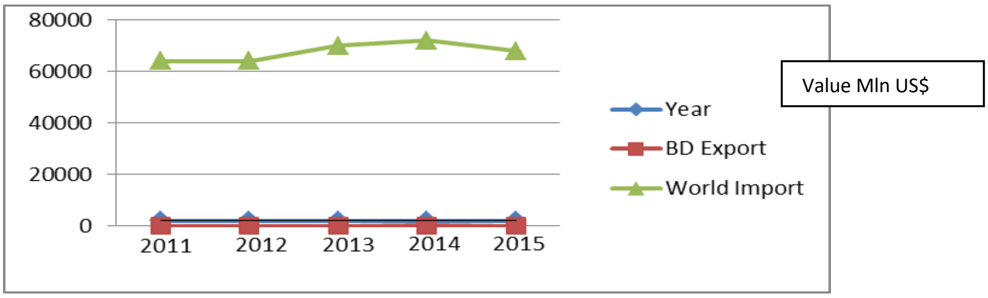

উৎস:রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও আইটিসি ট্রেড ম্যাপ

উপরোক্ত তথ্য চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কৃষি উপযোগী বাংলাদেশে Ready to Eat পর্যায়ের শাক-সব্জির রপ্তানি সম্প্রসারণের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। স্থিতিশীল বাজার এবং উপযোগী মূল্য প্রদান নিশ্চিত করা হলে এদেশের কৃষকগণ শাক-সব্জির উৎপাদন বহুগুণে বাড়াতে সক্ষম। স্থিতিশীল বাজার এবং উপযোগী মূল্য প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থা এবং নিরাপদ সংরক্ষণ সুবিধা। কিন্তু বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ এ দুটি বিষয় পুরোপুরি উপেক্ষিত। সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ কৃষি খামার ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও রপ্তানিকারকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সংরক্ষণ সুবিধা গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে গ্রহণ করা হয় নাই।

বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমানে শাকসব্জি উৎপাদন হয়। কিন্তু Ready to Eat পর্যায়ের শাক-সব্জি প্রস্তুত হয় না। এমনকি Ready to cook পর্যায়েরও শাক-সব্জির চাহিদা বা সরবরাহ অভ্যন্তরীণ বাজারে পরিলক্ষিত হয় না। বিগত কয়েক বছর যাবৎ ফ্রোজেন আকারে Ready to cook পর্যায়ের শাক-সব্জি রপ্তানি হচ্ছে । তবে রপ্তানির পরিমান এখনও উল্লেখযোগ্য নয়। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তাজা শাক-সব্জির চাহিদা বিদ্যমান। অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে বাংলাদেশ প্রতিনিয়তই আন্তর্জাতিক বাজারে শাক-সব্জির রপ্তানি সম্পসারণ করে চলছে। তবে এসব শুধুমাত্র Ethnic বাজারে বিপণন হচ্ছে।

৬.৩ ফলমূলঃ বাংলাদেশে ৭০ জাতের ২৪৬ লক্ষ মেঃ টন ফল উৎপন্ন হয়। ফলমূল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের ৮ম বৃহৎ ফল উৎপাদনকারী দেশ। দেশে উৎপাদিত ফলের সিংহভাগ তাজা অবস্থায় বিপণন হয়ে থাকে। বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের মধ্যে কলা ও পেঁপে বছরের সব সময় পাওয়া যায়। অন্য প্রায় সকল ফল মৌসুমী। কিন্তু এসব মৌসুমী ফল সংরক্ষণে পর্যাপ্ত সুব্যবস্থা নেই।বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে Food and Agriculture Organization (FAO), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশন এর সমন্বিত উদ্যোগ ও সহযোগিতায় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ Chain shop, Walmart এ বাংলাদেশ আম রপ্তানির মাধ্যমে up stream market এ প্রবেশের সক্ষমতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ বিশ্বের ৮ম আম উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্তমানে দেশে ২৭০-এর অধিক জাতের ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশী পরিমান আম উৎপাদিত হচ্ছে। এদেশের আম অত্যন্ত সুস্বাদু। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ জেলায় আম উৎপাদিত হয়ে থাকে। কিন্তু আমের উৎপাদন ব্যবস্থায় মানব স্বাস্থ্যের জন্য সহনীয় পরিমানের চেয়ে বেশী পরিমানে ক্ষতিকারক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারসহ অন্যান্য কারণে উদ্বৃত্ত থাকা সত্বেও আম রপ্তানি সম্ভব হচ্ছিলনা। বর্তমানে FAO ও অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক প্রতিষ্ঠনের সহায়তার নিরাপদ আম উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণনের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ আম চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আম রপ্তানির জন্য National Action Plan প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া Ethnic market এ বেশ কয়েক বছর যাবৎ বিভিন্ন মৌসুমী ফল রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশে বিগত ৫ বছরে ফল উৎপাদনে ব্যবহৃত জমির পরিমান ও ফল উৎপাদন সংক্রান্ত অবস্থা নিম্নরূপ

সারণী-০৬

বৎসর	আবাদী জমির পরিমান (হেঃ)	মোট উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)
২০১০-১১	৬৩৭৫৪০	১০৫.২১
২০১১-১২	৬৫৭৫৩৫	১০৩.০৪
২০১২-১৩	৬৫৮৮৭৫	১০৫.৬৯
২০১৩-১৪	৬৮৩৯৭৪	৯৯.৭২
২০১৪-১৫	৬৯৩২৩৫	১০৬.০৮

উৎস: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

বাংলাদেশ ফল উৎপাদনের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য অবস্থানে পৌঁছলেও মানের দিক থেকে অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে Good Agriculture Practice অনুসরণ এবং প্যাকেজিং, পরিবহন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। প্রায় সব ধরণের ফল উৎপাদনে হরমোনের ব্যবহারসহ স্বাস্থ্য সম্মত নিয়ম-কানুন অনুসরণ না করেই প্রচুর রাসায়নিক সার ও ক্ষতিকারক কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। সংগ্রহ ও প্যাকেজিং ব্যবস্থাও সুষ্ঠু নয়। বিভিন্ন ক্ষতিকারক প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করে ফল সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ফলের এসব প্রি ও পোষ্ট হার্ভেস্টিং ব্যবস্থাদি স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য অনুকূল নহে। বাংলাদেশে মান সম্মত ফল উৎপাদনের সমস্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলো:

৬.৩.১ সমস্যাঃ

১. কৃষি ভূমির দূষণ;
২. নিদিষ্ট প্রোডাকশন অঞ্চল/ম্যাপ অনুযায়ী শাক-সব্জি ও ফলমূল উৎপাদন ব্যবস্থার অভাব ;
৩. Good Agriculture Practice অনুসরণ না করা;
৪. উৎপাদক/উদ্দোক্তা, বিপণনকারী ও ভোক্তা- এর মধ্যে যোগসূত্রের অভাব। চুক্তিবদ্ধ কৃষি খামার ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের রপ্তানিকারকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্টদের আগ্রহের অভাব;
৫. কৃষকবৃন্দের রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব এবং স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব;
৬. রাসায়নিক সার ও ক্ষতিকারক কীটনাশক ব্যবহার বৃদ্ধি;
৭. কীটনাশক উৎপাদক কোম্পানিসমূহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রদান ইত্যাদি বিপণন উন্নয়ন কৌশল ব্যবহার করে কীটনাশকের বিক্রয় বৃদ্ধিকরণ;
৮. পণ্য মানের অভাব;
৯. Sorting, Grading, Packing ও Storing-ইত্যাদির জন্য স্থানীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে প্যাকিং হাউজ এবং প্রশিক্ষিত/দক্ষ জনবলের অভাব;
১০. উদ্যান ফসল তথা শাক-সব্জি ও ফলমূলের মান নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ সংরক্ষণ, প্যাকেজিং ও পরিবহন সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উদাসীনতা;
১১. প্যাকেজিং, পরিবহন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিরাপদ ব্যবস্থার অভাব;
১২. নিরাপদ সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগের অভাব;
১৩. শাক-সব্জি ও মৌসুমী ফল সংরক্ষণে পর্যাপ্ত সুব্যবস্থার অভাব;
১৪. বিভিন্ন ক্ষতিকারক প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করে পচনশীল পণ্য শাক-সব্জি ও ফল সংরক্ষণ;
১৫. মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অপতৎপরতা;
১৬. ফাইটোস্যানেটারি সনদ প্রদানকারী সংস্থার সক্ষমতা ও গ্রহণ যোগ্যতার অভাব; এবং
১৭. উৎপাদক তথা কৃষক এবং খাদ্য পণ্য উৎপাদকবৃন্দের বাজার চাহিদা সম্পর্কে অজ্ঞতা।

৬.৩.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	নিরাপদ প্রিজারভেটিভ ব্যবহারে সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিতকরণ এবং উহাদের সহনীয় মাত্রার পরিমান নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা জোরদারকরণ।	কৃষি মন্ত্রণালয়, বিসিএসআইআর, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।
২.	দ্রুত ফাইটোস্যানেটারি সনদ প্রদানকারী সংস্থার জনবল ও ল্যাবরেটরীর সক্ষমতা ও মান সনদের গ্রহণ যোগ্যতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ; এবং	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩.	খাতের চাহিদা এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশনসহ সংশ্লিষ্ট কৃষি ও রপ্তানি সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপন এবং এসব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা চাহিদা উপযোগীকরণ।	কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও জন প্রশাসন মন্ত্রণালয় ।

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	ভূমির স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ উন্নত প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;	ভূমি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়
২.	প্রতিটি কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং উক্ত চিহ্নিত এলাকায় উপযোগী কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন নিশ্চিতকরণ করার লক্ষ্যে ফসল উৎপাদন ম্যাপ তৈরীকরণ;	ভূমি অধিদপ্তর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

৩.	জমির পরিমিত উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে মানসম্মত জৈব সার ও জৈব বালাইনাশক সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং এসবের উৎপাদন ও ব্যবহারে কৃষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;	কৃষি মন্ত্রণালয়
৪.	অজৈব সারের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, যথেচ্ছা কীটনাশকের ব্যবহার আইনগত ভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং বিজ্ঞপ্তি প্রদান বা বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে কীটনাশকের বিপণন উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থাদি আইনগত ভাবে নিষিদ্ধকরণ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে এসবের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও সরকার নিয়ন্ত্রনাধীনে এসব পণ্যের বিকল্প বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়।
৫.	চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;	কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সমিতি/ রপ্তানিকারক
৬.	আইসিএম (Intigrated Crops Management) বিষয়ে (কোন ফসলের পর কোন ফসল উৎপাদন হবে সে সমস্ত) হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ও কৃষি মন্ত্রণালয়
৭.	আইপিএম (Intigrated Pest Management)-কেমিক্যাল ছাড়া জৈবিকভাবে পোঁকামাকড় নিধন;	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ও কৃষি মন্ত্রণালয়
৮.	গ্রহণযোগ্য সার্টিফিকেশন ব্যবস্থাসহ উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিতপূর্বক কৃষিজাত পণ্য ও ফলমূল কমপক্ষে সেমি-অর্গানিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বিপণনে কৃষকবৃন্দকে উৎসাহিতকরণ;	কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সমিতি
৯.	যে সমস্ত শাক-সজি ও ফলমূলজাত খাদ্য পণ্যের ব্যাপক রপ্তানি বাজার রয়েছে যে সমস্ত খাদ্য পণ্যের উৎপাদক প্রতিষ্ঠান এবং কৃষকবৃন্দের সমন্বয়ে চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থায় রপ্তানি সম্ভাব্য এজাতীয় খাদ্য পণ্যের মান সম্মত কাঁচামাল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;	কৃষি মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
১০.	চাহিদা উপযোগী মান সম্মত প্যাকেজিং শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীবৃন্দকে উৎসাহিতকরণ;	শিল্প মন্ত্রণালয়
১১.	শাক-সজি ও ফলমূল উৎপাদন, প্রসেসিং, ট্রান্সপোর্টেশন, স্বাস্থ্যগত বিষয়াদি, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে Good Agricultural Practice, Good Manufacturing Practice, Standard Operating Procedure, Sanitation Standard Operating Procedure এর নীতিসমূহ অনুসরণ এবং বাংলাদেশ সরকারের নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ অনুসরণের কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিতকরণ;	কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
১২.	নিরাপদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিতের লক্ষ্যে ঢাকাসহ কমপক্ষে বিভাগীয় শহরের পাইকারী বাজারসমূহে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণ সুবিধা সৃষ্টিকরণ এবং বিভিন্ন সবজি ও ফলের সংরক্ষণ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নির্ণয়ের জন্য গবেষণা জোরদারকরণ;	কৃষি মন্ত্রণালয় ও মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
১৩.	উন্নত প্যাকেজিং, কুলচেইন ব্যবস্থায় পরিবহন ও সংরক্ষণ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাজা কৃষি পণ্যের ওজন ঘাটতি ও অপচয়ের পরিমান হ্রাসকরণ। স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন প্রিজারভেটিভের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং Ready to Cook/Ready to Eat এর প্রযুক্তি উন্নয়নে গবেষণা জোরদারকরণ,	কৃষি মন্ত্রণালয়
১৪.	দ্রুত প্রস্তাবিত বাংলা গ্যাপ প্রণয়ন এবং এ্যাক্রিডিটেশন গ্রহণের মাধ্যমে সর্বজনের নিকট এর গ্রহণ যোগ্যতা সৃষ্টি;	কৃষি মন্ত্রণালয়
১৫.	বাংলাদেশী খাদ্যের নিজস্ব মানের গ্রহণযোগ্যতা ও মান সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি। মান নিয়ন্ত্রণ ও সার্টিফিকেশনে ব্যবহৃত ল্যাবরেটরির অপ্রতুলতা দূরকরণার্থে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের উপস্থিতি নিশ্চিতসহ দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরীসমূহের ডাটা বেইজ তৈরী, এসব ল্যাবরেটরীজ এর এ্যাক্রিডিটেশন সম্পাদন এবং মান সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ল্যাবরেটরীসমূহের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্যে সকল ল্যাবরেটরীকে কাজে লাগানো;	বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড
১৬.	২০২১ সালের মধ্যে ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন আম রপ্তানির লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত এবং বিপণন উন্নয়ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আম রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ;	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
১৭.	বহিঃর্বিশ্বে বাংলাদেশি খাদ্যের গুণগত মান সম্পর্কে প্রচারের ব্যবস্থাকরণ এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক বিপণন উন্নয়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ;	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

১.	দেশের সকল অঞ্চল হতে দ্রুত ও উন্নত মানের কাঁচামাল সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, পরিবহন ও বিপণনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উন্নত অবকাঠামো নির্মাণ;	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়
২.	সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আরএন্ডডি কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মান সম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতের শাক-সব্জি ও ফলমূলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ; এবং	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি মন্ত্রণালয়
৩.	কোডেক্স মান অনুসারে উদ্যান ফসলের মান নির্ধারণ।	বিএসটিআই ও শিল্প মন্ত্রণালয়

৬.৪ আলুঃ প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে নিজস্ব জাতের আলু উৎপাদন হয়ে আসছে। নব্বই-এর দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশে উদ্ভাবিত জাতের আলুর চাষ শুরু হয়। আশির দশকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট নেদারল্যান্ডের জাতগুলোকে উন্নত করে দেশের আবহাওয়া উপযোগি করে তোলে। ফলে তিন মাসে ফলন হয় এমন উদ্ভাবিত জাতের আলুর উৎপাদন দেশে বাড়াতে সহায়তা করে। বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি এলাকা ছাড়া দেশের সব স্থানেই আলু চাষ হচ্ছে। তবে সবচেয়ে বেশি আলু ফলন হয় মুন্সিগঞ্জ, বগুড়া ও রংপুর জেলায়। এছাড়া নরসিংদি, নাটোর, নওগাঁ, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, যশোর, ঠাকুরগাও, পীরগঞ্জ ও লালমনিরহাট জেলায় প্রতি বছর আলুর চাষ হয়। জাতিসংঘের খাদ্য ও গবেষণা সংস্থার (এফএও) ২০১৩ সালের তথ্য অনুযায়ী আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে সপ্তম। মূলত: ২০০২ সাল হতে বাংলাদেশে আলু উৎপাদন ব্যাপক হারে বাড়তে থাকে। গত এক যুগে এ দেশে ৭১টি আলুর জাত উদ্ভাবন হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে অবমুক্ত প্রায় ৪০টি জাতের উন্নত আলু চাষাবাদ হচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল জাতের আলুবীজ সম্প্রসারিত হয়েছে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি আবাদি এলাকায়। এক দশক আগেও আলুর উৎপাদন ছিল ৫০ হাজার মেট্রিক টনের নিচে। বর্তমানে তা কোটি টনের দিকে এগিয়েছে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত আলুর জাতের সংখ্যা অনেক হলেও বিভিন্ন রপ্তানি বাজারে যে সব জাতের আলুর আবশ্যক বাংলাদেশে সেসব জাতের আলু নেই। এছাড়া আলুজাত সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপযোগী জাতের আলুর অভাব রয়েছে। আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এ সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। নতুবা আলুজাত সামগ্রী এবং আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পক্ষে অধিকতর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে দেশে ৯২ লক্ষ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হয়েছে। যার প্রাক্কলিত মূল্য ১১ হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিশ্বের ২৭টি দেশে বাংলাদেশের আলু রপ্তানি হচ্ছে। দেশে আলুর বাৎসরিক চাহিদা ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে বছরে গড়ে ৮০ লক্ষ টন আলু উৎপাদিত হচ্ছে।

আলু রপ্তানি বৃদ্ধির অন্যতম সমস্যা আলুর রোগ। দীর্ঘ সময়ব্যাপী ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে বাংলাদেশি আলু রপ্তানি নিষিদ্ধ রয়েছে। রাশিয়া আলুর বৃহৎ বাজার হলেও বাংলাদেশি আলুতে ব্রাউন রটের উপস্থিতি এবং ফাইটো-স্যানেটারী সনদ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে রাশিয়ায় বাংলাদেশি আলুর রপ্তানি সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। ইন্দোনেশিয়াসহ বেশকিছু দেশ মানগত সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে পণ্যের মান পরীক্ষণ ল্যাবরেটরির এ্যাক্রিডিটেশনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে। এসকল সমস্যাদি সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। সরকার এখাতের রপ্তানি উন্নয়নে ১০% নগদ সহায়তা প্রদান করছে। বাংলাদেশে আলু প্রধান খাবার হিসেবে বিবেচিত না হলেও বিশ্বের অনেক দেশে আলু প্রধান খাবার। বাংলাদেশে আলুর উৎপাদন সম্প্রসারণ সম্ভাবনা এবং বিশ্ব বাজার বিবেচনায় এটি বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপখাত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৬.৪.১ সমস্যাঃ

১. রপ্তানি বাজারের চাহিদা উপযোগী উচ্চ ফলনশীল জাতের আলু বীজের অভাব এবং আমদানিকৃত আলুর জাত ছাড়করণে অত্যাধিক সময় ক্ষেপন এবং আলু বীজ আমদানিকারকবৃন্দের টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় বীজ সম্প্রসারণের পরিবর্তে বীজ আমদানির মাধ্যমে চাহিদা পূরণের তৎপরতা;

২. বাংলাদেশ আলু উৎপাদনে বিশ্বের ৭ম স্থানে থাকলেও আলু রপ্তানি উপযোগী জাতের অভাবে আলুর রপ্তানি সম্প্রসারণে ধীর গতি অবস্থা;

৩. আলুতে ব্রাউন রটসহ রোগ বালাই-এর উপস্থিতি;

৪. আলুর জাত উন্নয়নে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থবিরতা;

৫. আলু উৎপাদনে Good Agriculture Practics (GAP) অনুসরণ না করা;

৬. চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থাপনার অভাবে বাজার চাহিদা উপযোগী মানের আলু উৎপাদিত না হওয়া;

৭. আলুর প্রি ও পোষ্ট হার্ভেস্টিং কার্যক্রম বিষয়ে কৃষকবৃন্দের যথোপযুক্ত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা;

৮. কোল্ড স্টোরেজে আলু সংরক্ষণে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাব যা রপ্তানির অন্তরায়;

৯. আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিবারণের জন্য শস্য বীমা প্রচলিত না থাকা; এবং

১০. চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থায় আলু উৎপাদন, রপ্তানি পর্যায়ে ব্যাংক ঋণ না পাওয়া এবং ব্যাংক ঋণের উপর সুদের হার বেশী থাকা।

৬.৪.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	রপ্তানি বাজারের এবং আলুজাত পণ্য খাতের চাহিদা উপযোগী আলুর উৎপাদন উৎসাহিত করার জন্য স্বল্প সুদে সরলীকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক ঋণসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ চাষব্যবস্থা প্রবর্তণ; এবং	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২.	আলুর উন্নত প্রি ও পোষ্ট হার্ভেস্টিং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য কৃষক পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	আলুর উৎপাদন ব্যবস্থায় GAP অনুসরণের রপ্তানিকারদের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিতকরণ;	কৃষি মন্ত্রণালয় ও হর্টেক্স ফাউন্ডেশন
২.	টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় আলু বীজ-এর চাহিদা পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ। এ লক্ষ্যে বিএডিসি’র সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বেসরকারি পর্যায়ে টিস্যুকালচার প্রক্রিয়ায় আলু বীজ (চারা) উৎপাদনে সহযোগিতাকরণ;	কৃষি মন্ত্রণালয়
৩.	আলুজাত পণ্য খাত এবং রপ্তানি বাজারের চাহিদা উপযোগী উন্নত জাতের আলুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ দূতাবাস/ হাই-কমিশনের সহযোগিতায় উন্নত জাতের আলুবীজ সংগ্রহ এবং ২ বছরের মধ্যে উক্ত জাত দেশে চাষের জন্য ছাড়করণ এবং টিস্যুকালচার প্রক্রিয়ায় বীজ উৎপাদন ও চাষ সম্প্রসারণ;	কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সমিতি
৪.	বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতসহ কোল্ড ষ্টোরেজ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে সঠিক মানের আলুর সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ;	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়
৫.	আলু উৎপাদন পর্যায়ে ঝুঁকি নিবারণের জন্য ঝুঁকি বীমা প্রবর্তণ এবং কোল্ড স্টোরেজ থেকে যথাযথ মানের আলুর রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান;	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৬.	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে রোগ বালাই মুক্ত এবং সর্বজন গ্রহণীয় (এ্যাক্রিডিটেড) মান সনদ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ২.০০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু রপ্তানির লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
৭.	আলুর উচ্চ ফলনশীল উন্নতজাত নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ।	কৃষি মন্ত্রণালয়

৬.৫ মাশরুমঃ মাশরুম একটি অনন্য সব্জি যা অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাস্থ্য ও ওষধি গুণসম্পন্ন খাবার। প্রাণীজ প্রোটিনের মত এতে কোলেষ্টেরল না থাকা এবং ফ্যাট কম থাকায় মাশরুমের প্রোটিন নির্ভেজাল এবং উত্তম প্রোটিনের উৎস্য যা সকল বয়সের মানুষের জন্য আদর্শ খাবার হতে পারে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই মাশরুম একটি সমাদৃত খাবার। মাশরুম রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সহায়ক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি ঘরেই অল্প জায়গায় চাষ করা যায় বিধায় জনসংখ্যার আধিক্যপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য এটি অত্যন্ত উপযোগী। তবে বাংলাদেশে উৎপাদিত মাশরুমের মূল্য প্রতিযোগিতার সক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম। কারণ হিসেবে এ পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত জায়গায় তাপমাত্রা নিম্ন পর্যায়ে রাখতে হয় যা এ পণ্যের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি করে। মাশরুম থেকে বিবিধ প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং ফুড সাপ্লিমেন্ট উৎপাদিত হতে পারে। সরকার কর্তৃক জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্পসারণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন, চাষ সম্প্রসারণ, খাদ্য হিসেবে ব্যবহার উৎসাহিতককরণ এবং বিপণন উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের ফলাফল ভালো হলেও এখনও এ ফসল উৎপাদনের ব্যাপকতা সেভাবে সম্প্রসারিত হয় নাই। তাই মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ ফসলের চাষ ও ব্যবহার সম্প্রসারণে অধিকতর নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৬.৫.১ সমস্যাঃ

১. বাংলাদেশের আবহাওয়ায় উচ্চ তাপমাত্রা মাশরুম উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্তরায় যা উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির কারণ;
২. উৎপাদন ও প্রসেসিং প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা;
৩. মাশরুম বীজের উচ্চ মূল্য;
৪. সীমিত অভ্যন্তরীণ বাজার;

৫. Post-harvest management, processing and packaging বিষয়ে মাশরুম চাষীদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা;

৬. মাশরুম চাষীদেরকে মাশরুমের ঔষধীগুনের দাবী করে বিপণনের পরিবর্তে সব্জি এবং প্রক্রিয়াজাত সব্জি হিসেবে বিপণনে উৎসাহিতকরণ; এবং

৭. উৎপাদন ব্যয় বেশী হওয়ায় রপ্তানি বাজারে পণ্যমূল্য অপ্রতিযোগী।

৬.৫.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠান
১.	মাশরুমের চাষ ও ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সরকার কর্তৃক মাশরুম উন্নয়ন ও কেন্দ্রের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; এবং	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি মন্ত্রণালয়
২.	মাশরুমের খাদ্যগুণ ও পুষ্টি সম্পর্কে সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণ।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও খাদ্য মন্ত্রণালয়

খ) মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা (০৩ বছর):

১.	উৎপাদন সম্প্রসারণ ও প্রসেসিং প্রযুক্তি বিতরণের লক্ষ্যে সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারণার ব্যবস্থাকরণ;	কৃষি মন্ত্রণালয়
২.	Pre & Post-harvest management, processing and packaging বিষয়ে মাশরুম চাষীদের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান;	কৃষি মন্ত্রণালয়
৩.	মাশরুম চাষের জায়গার তাপমাত্রা নিম্ন পর্যায়ে রাখার জন্য লাগসই হালকা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং	বিটাক ও শিল্প মন্ত্রণালয়
৪.	মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজার টার্গেট করে মাশরুমের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ।	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

৬.৬ ডাল ও তৈল বীজঃ মসুর, মুগ, মাশকালাই, খেসারি, ছোলা ইত্যাদি শস্যের সমন্বিত রূপ হলো দেশীয় ডাল। ধান ও গমের পাশাপাশি ডাল উৎপাদনের পরিমাণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের শরীরের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণে ডাল উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৭.৮৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৮.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন ডাল জাতীয় পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। হেক্টর প্রতি উৎপাদন ১.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন। রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ এ ডাল রপ্তানি নিষিদ্ধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত। দেশে উৎপাদিত ডাল দ্বারা অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ সম্ভব না হওয়ায় সরকার কর্তৃক এরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সুষম খাদ্য তৈরীতে ডাল একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। এসব বিষয় বিবেচনায় ডাল এর উৎপাদন বাড়ানো আবশ্যক। সরাসরি রপ্তানি সম্ভব না হলেও Ready to Eat পর্যায়ের মানুষের প্রধান খাদ্যসমূহ তৈরিতে এটি ব্যবহারের মাধ্যমে সুষম খাদ্য তৈরী ও পরোক্ষভাবে রপ্তানি হতে পারে।

ডাল-এর ন্যায় তৈল বীজেও একই অবস্থা বিরাজমান। দেশের তৈল বীজের ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি পূরণকল্পে বাংলাদেশে অপ্রক্রিয়াজাত অবস্থায় পর্যাপ্ত পরিমানে ক্রুড তৈল আমদানি করা হচ্ছে। দেশে বিপণন হচ্ছে এমন ধরণের তৈলের মান নিয়ে ভোক্তা পর্যায়ে সন্দেহ রয়েছে। মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের দুর্বল সক্ষমতা সাধারণ মানুষের এ সন্দেহ অধিকতর বৃদ্ধি করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৮৩৫.৯মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পামওয়েলসহ বিভিন্ন ভোজ্য তৈল আমদানি করে । কিন্তু বাজারের কোন পাম ওয়েল পাওয়া যায় না। মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে এ বিষয়ে খতিয়ে দেখা দরকার। বাংলাদেশে চালের কুঁড়া থেকে তৈল উৎপাদিত হচ্ছে যা বিশ্বে হার্ট ওয়েল হিসেবে পরিচিত। তৈল বীজের ঘাটতি থাকায় চালের কুড়ার তৈল উৎপাদনে অধিকতর মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। দেশে ইতোমধ্যেই ১১টি চালের কুঁড়া নিষিক্ত তৈল উৎপাদন শিল্প স্থাপিত হয়েছে। এগুলোর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩,৪৫০ মেট্রিক টন এবং কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত কুঁড়ার পরিমাণ ১২,৮০০ মেট্রিক টন। তবে এ শিল্পে মূল সমস্যা কাঁচামালের ঘাটতি। দেশে বছরে প্রায় ৯.০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন চালের কুঁড়া উৎপাদিত হয়। দেশে উৎপাদিত কুঁড়ার অধিকাংশ পাথরের হলারযুক্ত সেমি অটোমেটিক মিলে উৎপাদিত। এসব মিলে উৎপাদিত কুঁড়ায় তৈলের পরিমান ন্যূনতম পর্যায়ে থাকে যা তৈল নিষিক্তকরণের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় বেশী হওয়ায় মূল্য প্রতিযোগিতামূলক সম্পূর্ণ হয় না। রাবারের হলারযুক্ত অটোমেটিক রাইস মিলে উৎপাদিত কুঁড়ায় পর্যাপ্ত পরিমানে তৈল থাকে যা এ শিল্পের জন্য সহায়ক। কিন্তু বর্তমানে কাঁচামালের প্রাপ্যতার বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়ে ঢালাওভাবে চালের কুঁড়া নিষিক্ত তৈল শিল্প গড়ে উঠেছে। এতে কাঁচামালের চাহিদা ও যোগানের তারতম্যের কারণে কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে তৈলের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া তৈল নিষিক্তকরণের পরে কুঁড়ার খাদ্যমান হ্রাস পায় মর্মে প্রাণী সম্পদ সংস্থার মতামত রয়েছে যা ডেইরী ও পোল্ট্রি খাতের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। সার্বিক বিষয়দি বিবেচনায় রেখে চালের কুঁড়া নিষিক্ত তৈল শিল্প সম্প্রসারণের বিষয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। নতুবা এ শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থেকে যেতে পারে এবং বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ পর্যায়ে বাংলাদেশে বিদ্যমান পাথরের হলারযুক্ত সকল চাল কলসমূহকে রাবার হলারযুক্ত চাল কলে রূপান্তর করা যুক্তিযুক্ত। সরিষা, তিল, তিসি, সূর্যমূখী ইত্যাদি হতে বাংলাদেশে তৈল উৎপাদন হচ্ছে। ঘানির পরিবর্তে দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৈল মিল স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে তিল, তিসি রপ্তানি হচ্ছে। এসব সামগ্রীর ভেষজ গুণ রয়েছে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহ এসব সামগ্রী

ব্যবহার করে তৈলসহ বিবিধ খাদ্য পণ্য উৎপাদন করছে। বাংলাদেশে এসব সামগ্রির উৎপাদন বাড়িয়ে ক্ষুদ্র পর্যায়ে এসব সামগ্রীর খাদ্য কারখানা সম্পসারণের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে ধানের নিম্ন মূল্য হলেও চাহিদাজনিত কারণে চালের কুড়ার মূল্য বেশি। বাংলাদেশে বিগত ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে তৈল বীজের উৎপাদন পরিস্থিতি ছিল নিম্নরূপ:

সারণী-০৭

ফসলের নাম	**২০১৩-২০১৪ (লক্ষ মে. টন)**	**২০১৪-২০১৫ (লক্ষ মে. টন)**
সরিষা	৫.৯৬	৬.৬৬
তিসি	০.০৫	০.০৬
তিল (শীত)	০.১১	০.১৪
তিল (গ্রীষ্ম)	০.৮৭	০.৮৪
মোট তিল	**০.৯৯**	**০.৯৮**
সয়াবীন	১.৩৫	১.৩৩
সূর্যমূখী	০.০৪	০.০৬

উৎস: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

৬.৬.১ সমস্যাঃ

১. আবহাওয়া ও অন্যান্য পরিবেশজনিত কারণে ডাল ও তৈলবীজ সংবেদনশীল কৃষি পণ্য হওয়ায় একক প্রতি উৎপাদনের পরিমান খুব কম;

২. গবেষণা ও উন্নয়ন এর অভাব; এবং

৩. বাংলাদেশে ডাল ও তৈলবীজ এর উৎপাদন ব্যয় বেশী।

৬.৬.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	ডাল ও তৈলবীজ এর উৎপাদন উৎসাহিত করার জন্য সর্বোচ্চ ৫% সুদ হারে কৃষকদেরকে ঋণ দান;	অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	উচ্চ ফলনশীল জাতের ডাল ও তৈলবীজ চাষে উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ, প্রি ও পোষ্ট হার্ভেষ্টিং পর্যায়ে সহযোগীতার মাধ্যমে কৃষকবৃন্দকে উৎসাহিতকরণ।	কৃষি মন্ত্রণালয়

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

১.	গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ।	কৃষি মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয়

৭. মৎস্য ও প্রাণীজ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ব্যবহৃত প্রাথমিক পণ্যাদির উপ-খাতভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণন অবস্থাঃ

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে মৎস্য ও প্রাণীজ খাদ্য দখল করে রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণীজ খাদ্যের মৌলিক কাঁচামাল তাজা মাছ এবং প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাণীজ মাংস যা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের পশ্চাৎ সংযোগ পণ্য হিসেবে বিবেচিত। এ শিল্পে সেমি-প্রসেসড্ মৎস্য ও প্রাণীজ পণ্যাদিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কৃষি ভিত্তিক হওয়ায় বাংলাদেশ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের এসব কাঁচামাল পর্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যায়। নদী খালবিল বেষ্টিত বাংলাদেশে মৎস্যজাত খাদ্যের সম্ভাবনা সর্বাধিক। ক্ষুদ্র ভূখন্ডের দেশ হওয়ায় বাংলাদেশে প্রাণীজ কাঁচামালের ঘাটতি রয়েছে। তবে সকল পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ এসমস্যা সমাধানের উপায় হতে পারে। এসব প্রাথমিক পণ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পেও ব্যবহৃত হয়। আবার কিছু পণ্য সেমি-প্রসেসড্ পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণের পর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পসমূহ ব্যবহার করে থাকে।

অন্যান্য কৃষিজ উপ-খাতের তুলনায় মৎস্য উপ-খাতটি প্রায় দুই যুগ ধরে উন্নয়নের গতিধারায় এগিয়ে আছে। দেশের মোট জনগোষ্ঠির ১১ শতাংশের অধিক বা ১ কোটি ৮২ লক্ষ মানুষ এ খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬ এর তথ্য মতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ৩.৬৯ শতাংশ এবং মোট কৃষিজ আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৩.৮১ শতাংশ) মৎস্য খাত থেকে অর্জিত হয়। প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে মৎস্য খাতের অবদান অনেক। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণীজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে বিশ্বে ৫ম স্থান অধিকার করেছে।

বাংলাদেশের আমিষের চাহিদা পূরণের দিক থেকে মাছের পরেই পোল্ট্রি খাতের অবস্থান। এখাত দেশের প্রোটিনের চাহিদা ১৬ শতাংশ পূরণ করে থাকে। হাঁস ও মুরগীর সমন্বয়ে পোল্ট্রি খাত । তবে বাংলাদেশে পোল্ট্রি খাত হিসেবে মুরগী পালনকে বুঝানো হয়ে থাকে। হাঁসের খুব একটা বাণিজ্যিক খামার নেই। বাংলাদেশে পোল্ট্রি খাত থেকে উৎপাদিত ডিম ও মাংস কোনরুপ প্রসেসিং ব্যতিরেকে বিক্রয় হয়ে থাকে। পোল্ট্রি সামগ্রী থেকে এখন পর্যন্ত Ready to Eat পর্যায়ের তেমন উল্লেখ যোগ্য কোন খাদ্য তৈরি হয় না বললেই চলে।

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, এবং গোয়ালভরা গরু । ধান ও মাছ পর্যাপ্ত থাকলেও দেশে এখন গোয়াল ভরা গরু নেই। এর পিছনে মূল কারণ দেশে চারণযোগ্য ভূমির স্বল্পতা। তবে ডেইরী খামার এবং সরকারি সংশ্লিষ্ট সহায়ক প্রতিষ্ঠান দেশের ডেইরী খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।মৎস্য ও প্রাণীজ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উপ-খাত ভিত্তিক প্রাথমিক পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন অবস্থা, সমস্যা এবং করণীয় বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

৭.১ চিংড়ি ও অন্যান্য মাছঃ জলজ সম্পদে আমাদের দেশ খুবই সমৃদ্ধ। আমাদের জলাশয়ে প্রায় ৮০০ প্রজাতির মিঠা ও লোনা পানির মাছ ও চিংড়ি রয়েছে। বর্তমানে মিঠা পানির মাছের উৎপাদন মূলত: চাষ নির্ভর এবং লোনা পানির মাছ মূলত: আহরণ নির্ভর। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মাছ চাষ হলেও এখাতে বিবিধ দুর্বলতা বিদ্যমান। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান দুর্বলতাই হচ্ছে গুনগত মানসম্পন্ন পোনা এবং মান সম্পন্ন মৎস্য খাদ্যের সহজলভ্যতা। পরিবেশ ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা যেমন অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, খাল, বিল, নদী নালায় পানির শূন্যতা, শস্য ক্ষেতে কীটনাশকের অবাধ ব্যবহার, পানি দূষণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে প্রাকৃতিক উৎসে রেনু উৎপাদনসহ পোনা উৎপাদন ও আহরণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। পানির সাথে পরিবেশের ও মাছের সাথে পানির সম্পর্ক এবং দূষণের অবস্থা বিবেচনায় এনে নির্মল জলজ পরিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন। মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে 'পরিবেশ ও জলজ সম্পদ' উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে যা দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

বর্তমানে প্রাকৃতিক উৎসের মাছ দূর্লভ হয়ে উঠছে। তবে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মৎস্য ভান্ডার এখনও সেভাবে আহরণের আওতায় আনা সম্ভব হয় নাই। সমুদ্রে মৎস্য সম্পদের পরিমান, টিকসই আহরণ, আহরণযোগ্য প্রজাতি ইত্যাদি বিষয়ে জরীপ থাকা আবশ্যক যা এখনও সম্পাদিত হয় নাই। বর্তমান সরকারের অনুমোদিত একটি প্রকল্পের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় নির্মিত জরীপ ও গবেষণা জাহাজ 'আরভি মীন সন্ধানী' ইতোমধ্যে বাংলাদেশে এসেছে। আশা করা যাচ্ছে যে, অচিরেই জাহাজটি ব্যবহারের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে যা থেকে সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনাও সম্ভব হবে। মৎস্য সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার, সম্ভাবনা এবং বিগত ৬ বছরে বিভিন্ন উৎস্য হতে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ নিম্ন দেখানো হলোঃ

সারণী-০৮ (লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	**২০০৯-১০**	**২০১০-১১**	**২০১১-১২**	**২০১২-১৩**	**২০১৩-১৪**	**২০১৪-১৫**
১.অভ্যন্তরীণ						
ক) মুক্ত জলাশয়	১০.৭৫	১০.৫৫	৯.৫৭	৯.৬১	৯.৯৫	১০.০৪
খ) চাষকৃত	১৪.২৬	১৪.৬০	১৭.২৬	১৮.২৬	১৯.৫৬	২০.৮০
মোট(অভ্যন্তরীণ)	**২৪.০২**	**২৫.১৫**	**২৬.৮৩**	**২৮.৮১**	**২৯.৫১**	**৩০.৮৪**
মোট(সামুদ্রিক)	৫.১৭	৫.৪৬	৫.৭৮	৫.৮৯	৫.৯৬	৫.৯৯
সর্বমোট	২৮.৯৯	৩০.৬১	৩২.৬১	৩৪.১০	৩৫.৪৭	৩৬.৮৪
বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার (%)	৭.৩২	৫.৬০	৬.৫৪	৪.৫৫	৪.০৪	৩.৮৪

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫

বাংলাদেশে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির তিনটি প্রধান সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে যথা: (ক) Fresh water aquaculture এর মাধ্যমে মিঠা পানিতে গলদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি; (খ) কমপক্ষে সেমি-ইনটেনসিভ কালচারের মাধ্যমে লোনা পানির বাগদা চিংড়ি উৎপাদন: এবং গ) Inland capture sector এ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। চিংড়ি শিল্পের উন্নয়ন উর্ধ্বমুখি হলেও গুণগত মানের চিংড়ির অভাব ও চিংড়ির কম উৎপাদনশীলতা এ খাতের মূল সমস্যা। পর্যাপ্ত কাঁচামালের অভাবে দেশে স্থাপিত মোট চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহের উৎপাদন সক্ষমতার মাত্র ২০% ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশিষ্ট ৮০% উৎপাদন সক্ষমতা অব্যবহৃত অবস্থায় থেকে যাচ্ছে। এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হলে দেশে বিদ্যমান হিমায়িত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পসমূহের পুরো উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের পরেও সম্প্রসারণের প্রয়োজন হবে এবং পর্যায়ক্রমে

দেশে Ready to Eat পর্যায়ের মৎস্য শিল্প গড়ে উঠবে। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য চিংড়ির গড় উৎপাদন প্রতি হেক্টরে মাত্র ৩৫০ কেজি (একরে ১৪০ কেজি)। অথচ প্রতিযোগি দেশ ভারতে হেক্টর প্রতি চিংড়ির উৎপাদন ৬০০-৭০০ কেজি, ভিয়েতনামে ১০০০-১২০০ কেজি এবং থাইল্যান্ডে উৎপাদন ১৬০০-২০০০ কেজি। উন্নত ঘের ব্যবস্থাপনা, মাছের জন্য উন্নত গুণগত মানের খাদ্য, নিরোগ পোনা ও অন্যান্য উপকরণ যথাযথ মানে সরবরাহ নিশ্চিতপূর্বক সেমি- ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হলে চিংড়ি চাষ কয়েকগুণে বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাংলাদেশে কমপক্ষে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৫,০০০ কেজিতে উন্নীতকরণ সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশে ২.৫০ লক্ষ থেকে ২.৭৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে। এর মধ্যে কম-বেশি ২.১৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে। সেমি-ইনটেনসিভ পদ্ধতির আওতায় ১.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে বাগদা চিংড়ি চাষ করা হলে প্রতি বছর ৫০০.০০ মিলিয়ন কেজি চিংড়ি উৎপাদিত হতে পারে। Head on প্রতি কেজি চিংড়ির দাম কমপক্ষে ১০.০০ মার্কিন ডলার। এ হিসেবে ৫০০.০০ মিলিয়ন কেজি চিংড়ির মূল্য দাঁড়াবে ৫,০০০.০০ মিলিয়ন বা ৫.০০ বিলিয়িন মার্কিন ডলার যা ২০২১ সালের মধ্যে অর্জন সম্ভব হতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে এ খাতে চিহ্নিত সমস্যাদি আলোকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশে প্রকৃতি নির্ভর চাষ ব্যবস্থাজনিত কারণে খাদ্যের কাঁচামালের ঘাটতি অনেক। এ ঘাটতি পূরণের জন্য কমপক্ষে সেমি-ইনটেনসিভ পর্যায়ে মাছ চাষের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে। এতে চিংড়িসহ অন্যান্য মাছের উৎপাদন কমপক্ষে হেক্টর প্রতি ৫০০০ কেজিতে উন্নীতকরণ সম্ভব হবে। এর জন্য প্রয়োজন মান সম্পন্ন মাছের পোনা, উন্নত মানের ফিস ফিড, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং চাষ ব্যবস্থা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা। মাছ সংশ্লিষ্ট খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশে হ্যাচারী ও ফিস ফিড শিল্পের সম্প্রসারণ এবং মাছ নির্ভর খাদ্য Ready to Eat পর্যায়ের শিল্পের বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠতে পারে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের তরফ হতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান আবশ্যক। এক্ষেত্রে মৎস্য উৎপাদনের ঘনত্ব বিবেচনাপূর্বক মৎস্য উৎপাদনে সহায়ক সরকারি প্রতিষ্ঠানের জনবল জেলাওয়ারী বিভাজনের পরিবর্তে ঘনত্ব ওয়ারী বিভাজন করা আবশ্যক। চিংড়ি চাষে জড়িত চাষিদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং প্রযুক্তিগত ঘাটতির কারণে বাংলাদেশের পক্ষে এখনও ইনটেনসিভ বা সেমি-ইনটেনসিভ কালচার এ যাওয়া সম্ভব হয় নাই। চিংড়ি প্রসেসর এবং চিংড়ি চাষীদের মধ্যে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের চিংড়ি খাত সাদা স্বর্ণে পরিণত হতে পারে। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থায় প্রসেসরদের এগিয়ে আসা দরকার ।

৭.১.১ সমস্যাঃ

১. মাছ চাষের ক্ষেত্রে জলজ পরিবেশ দুষণ যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে;

২. মাছ চাষের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎসহ অবকাঠামোগত এবং ইউটিলিটি সুবিধাদির অভাব;

৩. মান সম্পন্ন হ্যাচারী ও অন্যান্য প্রজনন কেন্দ্রের মাধ্যমে নিরোগ ও পরীক্ষিত পোনা সরবরাহে অনিশ্চয়তা বিদ্যমান;

৪. চিংড়ি হ্যাচারীসমূহের অবস্থান কক্সবাজার। হ্যাচারী থেকে কক্সবাজারে চিংড়ি পোনা পরিবহন সময় সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং পোনার মানগত অবস্থার অবনতি;

৫. মাছের মান সম্পন্ন খাদ্যের অভাব এবং এ্যান্টিবায়টিকসহ মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতি যা খাদ্য আকারে মানব দেহে উপস্থিতির সম্ভাবনা;

৬. মাছ চাষ রোগ প্রতিরোধমূলক ও মোটাতাজাকরণের কাজে এন্টিবায়োটিকসহ বিবিধ ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার;

৭. মাছ-এর খাদ্য মূল্য বেশি;

৮. বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় মৎস্য সম্পদের সংখ্যা, পরিমান ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যের অভাব এবং গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সক্ষমতার অভাব;

৯. মাছ উৎপাদনে HACCP অনুসৃত না হওয়া;

১০. মৎস্য চাষীদের প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাবে মাছের কম উৎপাদনশীলতা;

১১. মৎস্য চাষীদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা;

১২. মৎস্য চাষীদের বাজার চাহিদা সম্পর্কীত জ্ঞানের অভাব;

১৩. মৎস্য চাষী, প্রসেসরস এবং বিপণন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও আস্থাহীনতা;

১৪. মাছের মান ও মূল্যের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিক অপতৎপরতা;

১৫. মাছ পরিবহন এবং সংরক্ষণ অবকাঠামোগত সুবিধাদির অভাব;

১৬. পণ্যের গ্রহণযোগ্য মান এবং দুর্বল মান নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর কারণে বিশ্বে বাংলাদেশী খাদ্যের নেগেটিভ প্রচারণা; এবং

১৭. রপ্তানি বাজারে বিপণন উন্নয়ন কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা।

৭.১.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	চিংড়িসহ মাছ চাষের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান সম্মত পরিবেশ এবং উন্নত অবকাঠামো অবস্থা (পানির গভীরতা, জলজ পরিবেশ, বিদ্যুৎ, উন্নত যোগাযোগ ইত্যাদি) নিশ্চিতকরণ;	মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
২.	প্রতিটি হ্যাচারীর পোনার নিরোগ অবস্থা নিরূপন সুবিধার বিদ্যমানতা, পরীক্ষিত পোনার সরবরাহ বাধ্যতামূলককরণ এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় বা অন্য সুবিধাজনক উপয়ে নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিতকরণ;	মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়
৩.	কক্সবাজার থেকে খুলনা অঞ্চলে চিংড়ির পোনা সরবরাহে বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনাকরণ;	মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
৪.	মানসম্পন্ন মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিএসটিআই প্রণীত মানের মাছের খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং মাছের খাদ্যের সরবরাহ বিএসটিআই-এর বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশনের আওতায় আনয়ন। প্রয়োজনে মৎস্য খাদ্যের বাংলাদেশ মান যুগোপযোগিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ। বিএসটিআই মানে অথবা এ্যাক্রিডিটেড মানে উৎপাদিত নয় এমন মৎস্য খাদ্যের বিপণন বাংলাদেশে নিষিদ্ধকরণ;	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বিএসটিআই
৫.	চিংড়ি ও মৎস্য চাষ ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় এখাতে বীমা প্রথা চালু করা;	অর্থ মন্ত্রণালয়
৬.	চিংড়ি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে পোনা, খাদ্য, বিদ্যুৎ ও কেমিক্যাল ইত্যাদি উপকরণের উপর আরোপিত শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহারকরণ;	অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭.	কৃষিজাত ফসল গবাদি পশু, হাস-মুরগী ইত্যাদি পালনে ক্ষতিকারক Pesticide, এ্যান্টিবায়টিক ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জলজ পরিবেশ উন্নয়নপূর্বক মান সম্পন্ন মাছ চাষ নিশ্চিতকরণ; এবং	কৃষি মন্ত্রণালয়
৮.	মৎস্য ও চিংড়ি চাষকে উৎসাহিতকরণের জন্য Single digit এ ঋণ প্রদান।	অর্থ মন্ত্রণালয়

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	বিদ্যমান ফিস প্রসেসিং কারখানাসমূহের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অধিক চিংড়ি উৎপাদনের জন্য Improve Extensive Culture, Semi-intensive culture ও Cluster ভিত্তিক চিংড়ি উৎপাদন;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর
২.	চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন নিশ্চিতকরণ;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর
৩.	বৈদ্যুতিক সুবিধাদিসহ অবকাঠামো, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সুবিধা প্রদানপূর্বক ২০২১ সালের মধ্যে খুলনা (কালিগঞ্জ উপজেলা, সাতক্ষীরা বা অন্যত্র) এবং কক্সবাজার অঞ্চলের সুবিধাজনক এলাকায় কমপক্ষে ১.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থায় সেমি-ইন্টেনটিভ কালচারের মাধ্যমে চিংড়ি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ। এক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা যায়;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়
৪.	উপকূলীয় চিংড়ি চাষ অঞ্চলে খাল ভরাট হওয়ায় সীমিত পরিমাণের লোনা পানির সীমিত সরবরাহ বাড়ানোর জন্য খালসমূহ পুন:সংস্কারকরণ;	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৫.	বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি ও ইলিশ মাছকে 'জাতীয় ব্র্যান্ড' হিসেবে বিশ্বে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ;	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
৬.	বাংলাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে ভেনামী চিংড়ি চাষে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর
৭.	মৎস্য চাষ এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বরফ কল স্থাপন উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে স্বল্প সুদে ঋণদানসহ প্রয়োজনীয় উৎসাহমূলক সুযোগ সুবিধা প্রদান; এবং	শিল্প মন্ত্রণালয়
৮.	মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ, মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত জনবলের বিভাজন জেলাওয়ারী না করে মাছ চাষের ঘনত্ব অনুযায়ী নির্ধারণ।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

১.	মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে প্রণীত 'পরিবেশ ও জলজ সম্পদ' উন্নয়ন কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়ন; এবং	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর
২.	মাছের উচ্চ ফলন এবং উন্নতজাত নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর।

৭.২ অপ্রচলিত জলজ প্রাথমিক খাদ্যঃ বাংলাদেশের মিঠাপানি এবং লোনা পানি উভয় ক্ষেত্রে অপ্রচলিত বহুবিধ জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল। এসব প্রাণী ও উদ্ভিদের অধিকাংশের খাদ্যগুণ রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এসব প্রাণী ও উদ্ভিদ খাদ্য হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কিন্তু বাংলাদেশে ধর্মীয় এবং ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে খাদ্য হিসেবে এসব সামগ্রী ব্যবহার করা হয় না। খাদ্যমান বিবেচনায় এসব জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ অত্যন্ত উপাদেয় সামুদ্রিক মৎস্য ভান্ডারে হাঙ্গড়ের পাখনা, টুনা, ইলিশ, শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, কুঁচে, কুমির, কচ্ছপ, শৈবালসহ বহু প্রজাতির অপ্রচলিত সামুদ্রিক সম্পদ দ্বারা দেশের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ সম্ভব। দেশের জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার লক্ষ্যে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অপ্রচলিত জলজ প্রাণীর উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রজনন, চাষ ও সংরক্ষণ এখন সময়ের দাবি। বিশ্বে অপ্রচলিত জলজ পণ্যের ব্যাপক চাহিদা থাকায় সুষ্ঠু প্রজনন ও আহরণ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতপূর্বক বিপণন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশ অপ্রচলিত জলজ খাদ্য থেকে পর্যাপ্ত পরিমানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে। নিম্নে অপ্রচলিত প্রাথমিক খাদ্য পণ্যের বিবরণ দেয়া হলো:

৭.২.১ কাঁকড়াঃ বাংলাদেশে মোট ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায়। এর মধ্যে সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত পানিতে ১১ প্রজাতির কাঁকড়া রয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির কাঁকড়ার মধ্যে শীলা কাঁকড়া (Scylla Serrata) চাষযোগ্য, দ্রুত বর্ধণশীল এবং বাণিজ্যিকভাবে ফ্যাটেনিংযোগ্য। স্ত্রী কাঁকড়ার ফ্যাটেনিং ও পুরুষ কাঁকড়ার হার্ডেনিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ কাঁকড়ার কৃত্রিম প্রজননে সফলতা পেয়েছে। তবে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে প্রাপ্ত কাঁকড়ার বাচ্চা অপর বাচ্চাকে খেয়ে ফেলে। বর্তমানে বাংলাদেশে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থায় মাত্র ৫% কাঁকড়ার বাচ্চা বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে। প্রসংগত উল্লেখ্য, একটি কাঁকড়া ৫০ লক্ষ পর্যন্ত ডিম দিতে পারে। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থায় কাঁকড়ার বাচ্চা বাঁচিয়ে রাখার হার বৃদ্ধির জন্য গবেষণা অব্যাহত রেখেছে। এ কাজে সফলতা পেতে হয়তবা ৩/৪ বছরের অধিক সময় লাগতে পারে। বিশ্বের কয়েকটি দেশ কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থায় ১০% থেকে ১৫% পর্যন্ত কাঁকড়ার বাচ্চা বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে জীবন্ত অবস্থায় Hard crub রপ্তানি করা হয়ে থাকে। তবে সম্প্রতি সৃষ্ট কয়েকটি সফট ক্রাব তৈরীর ফার্ম সফট ক্রাব চাষ এবং প্রসেসিংপূর্বক রপ্তানি শুরু করেছে। কিছু কিছু ঘের/পুকুরে ১০০ গ্রাম থেকে ১২৫ গ্রাম ওজনের কাঁকড়ার রেনু সৃজনের পর Hard crub হিসেবে রপ্তানি করা হচ্ছে। হ্যাচারীতে কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হলে প্রাকৃতিক উৎসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দেশের উপকূলে কাঁকড়ার চাষ ক্রমশ সম্প্রসারিত হবে।

কাঁকড়ার অন্য একটি ভক্ষণযোগ্য প্রজাতি নীল কাঁকড়া (Blue swimming crab, Portunus pelagicus) সমুদ্রে মাছ ধরার সময় প্রচুর পরিমানে ধরা পড়ে যা সুইমিং কাঁকড়া হিসেবে পরিচিত। বর্তমান পরিবেশ আইনের অন্তরায় এসব কাঁকড়া আহরণ নিষিদ্ধ। যার কারণে এসব কাঁকড়া রপ্তানি করে যে আয় হতো বর্তমানে তা অর্জিত হচ্ছে না অথচ এগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের সকল দেশই সুইমিং কাঁকড়া আহরণ করে থাকে। একটি কাঁকড়া থেকে যে পরিমান বাচ্চা জন্ম নেয় তাতে সুইমিং কাঁকড়া রপ্তানি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হবে না বলে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান মনে করে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। দেশে খাচায় কাঁকড়ার চাষ শুরু হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে 'কাঁকড়া ও কুঁচে চাষ এবং গবেষণা' শিরোনামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশে সম্প্রতি অতি সামান্য পরিমাণ কাঁকড়া প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে প্রসেসড কাঁকড়ার বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমান ছিল যথাক্রমে ২,৬৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২,৭৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২,৭৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৩,০৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৩,০৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে বাংলাদেশ হতে কাঁকড়ার রপ্তানির পরিমান ছিল যথাক্রমে ০.৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ০.০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ০.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অথচ বাংলাদেশে প্রসেসড কাঁকড়ার রপ্তানি শূণ্যের কোঠায় রয়েছে বলা যায়। এ পর্যায়ে কাঁকড়ার চাষ সম্প্রসারণ করে কাঁকড়া প্রসেসিং এবং Ready to Eat পর্যায়ের কাঁকড়া সংশ্লিষ্ট খাদ্য উৎপাদন কারখানা গড়ে উঠতে পারে। বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমান বিবেচনায় কাঁকড়া শিল্প বাংলাদেশে হিমায়িত চিংড়ি শিল্পের চেয়েও বেশী অবদান রাখতে পারে। প্রসংগত উল্লেখ্য, বাংলাদেশে চিংড়ি

প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহ বছরে প্রায় ৩/৪ মাস অলসভাবে বসে থাকে। অলসভাবে বসে থাকাকালীন সময়ে চিংড়ি প্রসেসিং কারখানাগুলো কাঁকড়া প্রসেসিং কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং চিংড়ি প্রসেসিং কারখানাগুলোর পুরো উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের এফআইকিউসি সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান শিথিল করা যেতে পারে। নিম্নে উপস্থাপিত বাংলাদেশ হতে কাঁকড়ার রপ্তানি ও বিশ্ব আমদানির তুলনামূলক তথ্য চিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান নেই বললেই চলে যা সম্প্রসারিত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছেঃ

তথ্য চিত্র-০৩

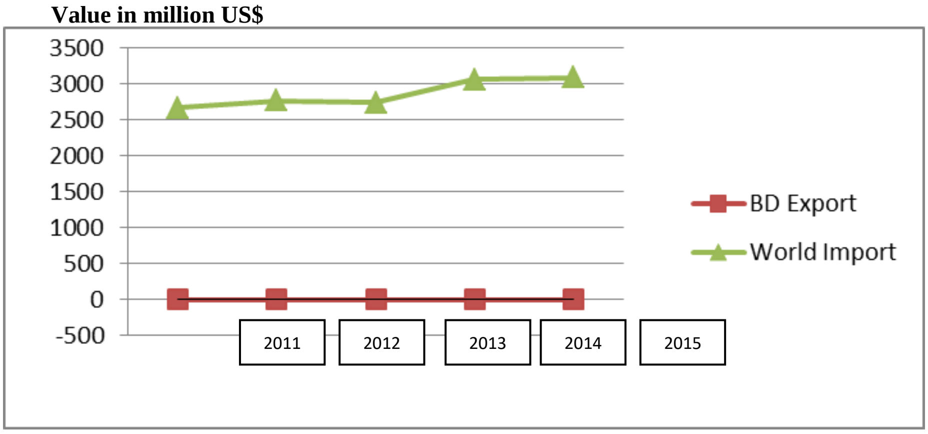

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও আইটিসি ট্রেড ম্যাপ

৭.২.২ **কুঁচেঃ** দেখতে সাপের মত হলেও কুঁচে এক প্রকার মাছ। দেশের খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর, ধানক্ষেত ও বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমানে প্রাকৃতিক কুঁচে বা ইল ফিস (Monopterus Cuchia) পাওয়া যায়। পুষ্টিমান বিবেচনায় কুঁচের পুষ্টির পরিমান অন্যান্য মাছের তুলনায় বেশি। রক্ত শূন্যতা দূরীকরণ, উচ্চ রক্তচাপ ও ক্যান্সার প্রতিরোধে কুঁচে খুবই উপকারী। তেমন অভ্যন্তরীণ বাজার না থাকায় আহরিত ইল ফিসের পুরোটাই রপ্তানি হয়ে থাকে। ইল ফিস রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে রপ্তানি আয় অর্জন করেছে ৫.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কৃত্রিম উপায়ে কুঁচের পোনা উৎপাদনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কুঁচের পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ কুঁচে চাষের জন্য বেশ উপযোগী।

৭.২.৩ **শামুক-ঝিনুকঃ** বাংলাদেশে শামুকের প্রায় ৪৫০টি প্রজাতি রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাপ্য দুটি প্রজাতি হলো Pila globosa (আপেল শামুক) ও Viviparus bengalensis (পন্ড স্নেইল)। সাধারণত শামুকের মাংসল অংশ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমরা খাদ্য হিসেবে শামুক গ্রহণে অভ্যস্ত নই। এছাড়া শামুকের ব্যাপক ব্যবহার হয় বাগদা বা গলদা চিংড়ির খাদ্য হিসেবে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে চিংড়ি ঘেরগুলোতে দিনে প্রায় গড়ে ৬৭ কেজি/হেক্টর-এ শামুকের মাংস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শামুক চাষের মাধ্যমে দেশের অনগ্রসর উপজাতি জনগোষ্ঠীর স্বল্প খরচে আমিষ চাহিদা পূরণ হতে পারে। পুকুরে মাছের সাথে শামুকের পরিকল্পিত সমন্বিত চাষ বা এককভাবে শামুকের চাষ করা যেতে পারে

৭.২.৪ **কচ্ছপঃ** বিশ্ববাজারে মানুষের উপাদেয় খাদ্য হিসেবে কচ্ছপের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ২৫টি প্রজাতির কচ্ছপ রয়েছে। তবে এদের মধ্যে ১১টি প্রজাতি মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কচ্ছপের বিভিন্ন প্রজাতি সাগর থেকে শুরু করে নদী-নালা, পুকুর, ডোবা ও স্থলে বাস করে। মিঠাপানির কচ্ছপের অধিকাংশই তৃণভোজী এবং এ কারণে এরা জলজ শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে মৎস্য প্রজাতির জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করে। ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াসহ এশিয়ার অনেক দেশেই কচ্ছপের বাণিজ্যিক চাষ হয়। এদেশে বিদ্যমান কচ্ছপের বিভিন্ন প্রজাতিসমূহের মধ্যে নরম খোলসধারী কচ্ছপ (Aspiderestes gangeticus, A. huruma ও Lissemys punctata) চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কচ্ছপ চাষ অনেকাংশে কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত বাচ্চা ও সম্পূরক খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই এ চাষ ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে কচ্ছপের কৃত্রিম প্রজনন, ব্যাপক পোনা উৎপাদন ও সম্পূরক খাদ্য তৈরির কৌশল বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক পরিবেশে কচ্ছপের প্রাচুর্য নিরূপণের জন্য বিভিন্ন পরিবেশগত অঞ্চলে জরীপ পরিচালনা আবশ্যক।

৭.২.৫ **কুমিরঃ** বর্তমানে বাংলাদেশে তিন প্রজাতির কুমির পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে মিঠাপানির কুমির (Crocodylus Palustris), লোনাপানির কুমির (Crocodylus Porosus) ও ঘড়িয়াল (Gavialis gangeticus)। IUCN-এর বাংলাদেশ রেড লিস্ট অনুসারে মিঠাপানির কুমির এখন বিলুপ্ত প্রায়, অপর ২টি প্রজাতিও বিপর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

সুন্দরবনের করমজলের নদীতে লোনাপানির কুমিরের প্রজনন সফলতা পাওয়া গেছে, যদিও সুন্দরবনের নদীতে কুমিরের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে উদ্যোক্তা পর্যায়ে ময়মনসিংহ, কক্সবাজার ও বান্দরবানে ৩টি কুমিরের খামার গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে কুমির CITES তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিধায় এটির বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত। প্রায় এক দশক পূর্বে মালয়েশিয়া থেকে আমদানিকৃত মিঠাপানির কুমির চাষ ও প্রজননের মাধ্যমে এখন বিদেশে কুমিরের মাংস ও চামড়া রপ্তানি হচ্ছে। কুমিরের শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। কুমিরের মাংস খাদ্য হিসেবে, চামড়া থেকে ব্যাগ, পার্স ও বেল্ট, হাড় থেকে সুগন্ধি, দাঁত থেকে গহনা এবং চোয়াল থেকে চাবির রিং তৈরি হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কচ্ছপ ও কুমির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রপ্তানিযোগ্য অপ্রচলিত মৎস্য পণ্য হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অপ্রচলিত মৎস্য পণ্য হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে কচ্ছপ ও কুমিরের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তাই এ সম্পদের বৈজ্ঞানিক চাষাবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৭.২.৬ শৈবালজাত খাদ্যঃ সামুদ্রিক শৈবাল সামুদ্রিক সব্জি হিসেবে পরিচিত। এটি একটি সম্ভাবনাময় জলজ উদ্ভিদ যা পুষ্টিমান অন্যান্য জলজ প্রজাতির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। পুষ্টি গুণের বিচারে বিভিন্ন দেশে খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে এটি বহুল ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচ্যে বিশেষত জাপান, চীন ও কোরিয়ায় সনাতন ভাবে দৈনন্দিন খাদ্যে শৈবাল ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে এবং দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইউরোপে এর ব্যবহার বৃদ্ধির প্রবনতা লক্ষ্য করা গেছে। মানব খাদ্য হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও ডেইরী, ঔষধ, টেক্সটাইল ও কাগজ শিল্পে আগার কিংবা জেলি জাতীয় দ্রব্য তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে শৈবাল ব্যবহৃত হয়। এছাড়া জমিতে সার, প্রাণীজ খাদ্য ও লবণ উৎপাদনে শৈবাল ব্যবহৃত হয়। স্রোতের প্রভাবমুক্ত ও দুষণমুক্ত সামুদ্রিক এলাকা শৈবাল চাষের জন্য উপযুক্ত। মূলত: জোয়ার-ভাটার অন্তবর্তী স্থান শৈবাল চাষের উপযুক্ত। তবে সে সব জায়গায় জনগণের চলাচল সীমিত থাকতে হবে। আমাদের দেশে সেন্টমাটিন দ্বীপ সংলগ্ন এলাকা শৈবাল চাষের জন্য বিবেচিত হতে পারে। এছাড়া কক্সবাজার ও সুন্দরবনের কিছু কিছু এলাকায় শৈবাল চাষের জন্য বিবেচনায় নেয়া যায়। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক ভাবে Catenella Vipae, Hypnea, Ulva এবং Enteromorphe জাতের শৈবাল পাওয়া যায়। সেন্টমাটিন দ্বীপের স্থানীয় জনগণ Hypnea নামীয় শৈবাল কুড়িয়ে পরে তা শুকিয়ে মায়ানমারে অবৈধভাবে বিক্রি করে। কিছু জাতের শৈবাল সার হিসেবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্বল্প বিনিয়োগে শৈবাল চাষ সম্ভব। শৈবাল চাষের জন্য উপযুক্ত জাত নির্বাচন করা আবশ্যক। শৈবাল থেকে সস, জেলী ইত্যাদি বহুবিধ খাদ্য তৈরি সম্ভব। সামুদ্রিক সব্জি হিসেবে মায়ানমার, জাপান, চীন, সিংগাপুর, হংকং, যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক ইত্যাদি বাজারে রপ্তানি করা যেতে পারে।

বিশ্ব ব্যাপি শৈবালজাত খাদ্যের ব্যাপক চাহিদা বিদ্যমান। ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে বিশ্বে শৈবালের আমদানির পরিমান ছিল যথাক্রমে ২০.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৮.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯.৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ১৭.৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আন্তর্জাতিক বাজারে শৈবাল ও শৈবালজাত খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শৈবালের ঔষধিগুণ রয়েছে। শৈবাল উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, টিউমারের বৃদ্ধি রোধ, গিটের ব্যাথা লাঘবে ও ডায়েরিয়া দূরীকরণে বেশ উপকারী। শৈবাল ফলিক এসিড ও বিভিন্ন ভিটামিন সমৃদ্ধ। ঔষধ প্রস্তুত ও মাছের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। সাধারণ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কম হওয়ায় সহজে বাংলাদেশে শৈবাল চাষ প্রর্বতন করা যায়। দেশে শৈবাল থেকে স্পুরিলিনা ব্যতিত অন্য কোন শৈবালজাত খাদ্য তৈরী সম্ভব হয় নাই । শৈবালের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিক পরিমানে শৈবালজাত খাদ্য উদ্ভাবনে মনোযোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে মেরিন সাইন্স ইনস্টিটিউট ও সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সরকারকে এ খাতের উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে দেশের মানুষের জীবনযাত্রা ও কর্মে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। যার কারণে ভাত নির্ভর খাদ্য আমাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। দেশের মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্যাভাসে পরিবর্তন আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে শৈবাল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। দেশে শৈবাল নির্ভর Food Supliment, ভিটামিন, সস, জেলি, মাছের খাদ্য ইত্যাদি বহুবিধ শিল্প গড়ে উঠতে পারে।

৭.৩. অপ্রচলিত প্রাথমিক জলজ খাদ্যের সমস্যা ও করণীয়ঃ অপ্রচলিত জলজ প্রাথমিক খাদ্য পণ্যের ব্যবহার বাংলাদেশে তেমন একটা নেই। যার কারণে অপ্রচলিত জলজ প্রাথমিক পণ্যাদি এখনও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে না। অথচ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কর্তৃক অপ্রচলিত জলজ পণ্যাদি দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশে অপ্রচলিত এসব জলজ পণ্যের সমস্যা ও করণীয় প্রায় একই প্রকৃতির যা নিম্নে দেয়া হলোঃ

৭.৩.১ অপ্রচলিত জলজ খাদ্যের সমস্যাঃ

১. পরিবেশ আইনে গৃহীত এতদসংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ তথ্য-উপাত্ত নির্ভর নয়;
২. পরিবেশ আইনের আওতায় বিদ্যমান বিধিবিধানজনিত কারণে কাঁকড়া ও অন্যান্য অপ্রচলিত জলজ প্রাণীর মোটাতাজাকরণ ও রপ্তানি বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে;
৩. অপ্রচলিত জলজ প্রাথমিক পণ্যের উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রমের অভাব;

৪. অপ্রচলিত জলজ প্রাথমিক পণ্যের চাষ/উৎপাদন বিষয়ে প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব এবং আহরণ/সংগ্রহ, গ্রেডিং, প্যাকেজিং পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে উৎপাদকবৃন্দের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা।
৫. কুমির CITES-এর আওতাভূক্ত হওয়ায় এ পণ্যের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত;
৬. গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সময় ধরা পড়া সুইমিং কাঁকড়া রপ্তানির উপর বিধি নিষেধ আরোপ;
৭. দেশে কুঁচে ও কাঁকড়ার কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তির অভাব;
৮. শৈবাল চাষ/সংগ্রহ, অগ্র সংযোগ পণ্য, শৈবাল সামগ্রির পরিধি, বাজার ইত্যাদি বিষয়ে সম্ভাব্য উৎপাদকবৃন্দের অজ্ঞতা;
৯. কাঁকড়া প্রসেসিং কারখানার ঘাটতি এবং চিংড়ি প্রসেসিং কারখানায় কাঁকড়া প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে বিধি নিষেধের বিদ্যমানতা;
১০ শৈবালের সীমাবদ্ধ অভ্যন্তরীণ বাজার; এবং
১১ অপ্রচলিত জলজ প্রাথমিক পণ্যের উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিতি এবং বিপণন উন্নয়ন কার্যক্রমের অভাব।

৭.৩.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	কুঁচে ও কাঁকড়াসহ অপ্রচলিত জলজ প্রাণী মোটাতাজাকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণপূর্বক রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকবৃন্দকে আর্থিক সহায়তাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিতকরণ;	মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।
২.	পরিবেশ আইনের আওতায় সুইমিং ক্রাবস্ রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ;	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়।
৩.	অলসভাবে বসে থাকাকালীন সময়ে চিংড়ি প্রসেসিং কারখানাগুলো কাঁকড়া ও অন্যান্য প্রচলিত জলজ প্রাণী প্রক্রিয়াকরণের কাজে ব্যবহার করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের এফআইকিউসি সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান শিথিল করা; এবং	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর।
৪.	CITES সনদ প্রদান সরলীকরণ এবং তা দ্রুত (১৫ দিনের মধ্যে) প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।	বাংলাদেশ বন বিভাগ এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়।

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	কাঁকড়ার কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ক গবেষণা জোরদারকরণ, সফট ক্রাবস এর উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত প্রযুক্তি উৎসাহী উদ্যোক্তাবৃন্দের নিকট হস্তান্তর;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর।
২.	শৈবালের চাষ সম্প্রসারণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণন উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি প্রকল্প গ্রহণ;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর।
৩.	অপ্রচলিত জলজ সম্পদ উৎপাদনে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান, গ্রেডিং, প্যাকেজিং ও পরিবহন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং	মৎস্য অধিদপ্তর।
৪.	খাদ্যসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে শৈবালের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ।	মৎস্য অধিদপ্তর ও তথ্য অধিদপ্তর।

গ) দীর্ঘমেয়াদি (০৫ বছর):

১.	পরিবেশ আইনের বিধি বিধানসমূহ বৈজ্ঞানিক তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ;	মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর।
২.	পরিবেশ ও জলজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, এবং বিসিএসআইআর।
৩.	অপ্রচলিত জলজ সম্পদ নির্ভর খাদ্য শিল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রাথমিক পণ্যাদির উপর গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর।
৪.	জলজ সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; এবং	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর।
৫.	শৈবালজাত খাদ্য উদ্ভাবনে মেরিন সাইন্স ইনষ্টিটিউট ও সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মেরিন সাইন্স ইনষ্টিটিউট এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. **খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সেমি-প্রসেসড্ পণ্যঃ** খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের চূড়ান্ত পণ্যের পশ্চাৎ সংযোগ পণ্য হিসেবে বিবিধ সেমি-প্রসেসড্ পণ্যাদি বিবেচিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমান প্রাথমিক কৃষি পণ্য আংশিক প্রক্রিয়াকরণ অর্থাৎ সেমি-প্রসেসড্ আকারে সাধারণতঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন হয়। এসব সেমি-প্রসেসড্ পণ্যের মধ্যে উদ্ভিদ, মৎস্য ও প্রাণীজ সকল প্রকার খাদ্য পণ্যই অন্তর্ভুক্ত। উদ্ভিদ, মৎস্য ও প্রাণীজ সেমি-প্রসেসড্ পণ্যের খাতওয়ারী বিদ্যমান অবস্থা, সমস্যা ও করণীয় বিষয়াদি নিম্নে আলোকপাত করা হলোঃ

৮.১ **সেমি-প্রসেসড্ শস্যজাত পণ্যঃ** বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত শস্যজাত প্রসেসড পণ্যের বাজার পরিধি ব্যাপক নয়। দেশের প্রায় সকল ভোক্তা সেমি-প্রসেসড্ পণ্য থেকে চূড়ান্ত খাদ্য তৈরি ও ব্যবহার করে। যার কারণে অভ্যন্তরীণ বাজারে সেমি-প্রসেসড্ শস্যজাত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা বিদ্যমান। এছাড়া প্রায় সকল স্বল্প উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে একই কারণে সেমি-প্রসেসড্ পণ্যের বাজার পরিধি বেশ বড়। দেশে এ জাতীয় পণ্যের উৎপাদন সম্প্রসারণ করে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণসহ রপ্তানির সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল।

শস্যজাত প্রাথমিক খাদ্য পণ্যের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধান এবং ভুট্টার অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে। সেমি-প্রসেসড্ অবস্থায় চাল, গম, ভুট্টা ইত্যাদি মানুষের খাদ্য চাহিদার পাশাপাশি পোল্ট্রি, ডেইরী এবং মাছের খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। প্রাণীর এসব খাদ্য উৎপাদনে মূলত: চালের কুঁড়া ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে দেশে চালের কুঁড়া থেকে ভোজ্য তৈল উৎপাদিত হচ্ছে। শুধুমাত্র অটোমেটিক রাইস মিলে উৎপাদিত চালের কুঁড়া থেকে ভোজ্য তৈল উৎপাদিত হয়। সেমি অটোমেটিক রাইস মিলের কুঁড়া এসব প্রাণীর খাদ্য ও এর ফ্যাট সাবানসহ বিবিধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সেমি-প্রসেসড্ গম ও ভুট্টার বর্জ্য শুধুমাত্র প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৮.১.১ সমস্যাঃ

১. কৃষিপণ্য উৎপাদনে কৃষকের বিবিধ অসুবিধা দূর করে মানসম্পন্ন সেমি-প্রসেসড্ শস্যজাত পণ্য উৎপাদন এবং ট্রেসিবিলিটি নিশ্চিত করণার্থে চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তণ সংক্রান্ত উদ্যোগের অভাব;
২. প্রাথমিক কৃষি পণ্যের পোষ্ট হার্ভেস্টিং পর্যায়ে যথাঃ গ্রেডিং, প্যাকেজিং, নিরাপদ পরিবহন ও নিরাপদ সংরক্ষণ সুবিধার অভাব। পণ্যের মান বজায় রেখে এসব ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে কৃষক/ উৎপাদকদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা;
৩. প্রাথমিক শস্যজাত কৃষি পণ্য এবং সেমি-প্রসেসড্ কৃষি পণ্যের মূল্যের অস্বাভাবিক পার্থক্যের কারণে সুষম উৎপাদন সম্প্রসারণে অন্তরায়;
৪. দেশে গমের ঘাটতি বিদ্যমান;
৫. সকল আমদানিকারক দেশে বাংলাদেশের ইস্যুকৃত সেমি-প্রসেসড্ শস্যজাত পণ্যের ফাইটোসেনিটারী সনদের গ্রহণযোগ্যতার অভাব এবং শস্য হতে তৈরী সকল খাদ্যের স্বাস্থ্য সনদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতি;
৬. সেমি-প্রসেসড্ শস্যজাত পণ্য চাল-এর কুঁড়ার অধিকাংশ সেমি অটোমেটিক মিলে উৎপাদনের কারণে কুঁড়ায় বিদ্যমান তৈল নষ্ট হয়ে যায় যা চালের মূল্যের উপর প্রভাব ফেলে; এবং
৭. সেমি-প্রসেসড্ শস্যজাত পণ্য উৎপাদনে মানের বিষয়টি উপেক্ষিত।

৮.১.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	সেমি-প্রসেসড্ শস্যজাত পণ্যের BDS মান নির্ধারণ ও নির্ধারিত মানে পণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বিএসটিআই।
২.	উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বিষয় বিবেচনাপূর্বক উৎপাদন মৌসুমে চাল, ভুট্টা ইত্যাদি সেমি-প্রসেসড্ শস্যজাত পণ্যের আমদানি বন্ধ রাখা;	খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
৩.	মূল্যের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ;	খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
৪.	দেশে বিদ্যমান সেমি অটোমেটিক চালের কলে রাবারাইজড্ হলার ব্যবহারের বিষয়াদি পরীক্ষাকরণ এবং অনুকূল অবস্থার ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা আরোপের ব্যবস্থাকরণ; এবং	বিটাক, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৫.	দ্রুত ফাইটোসেনিটারী সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরী এ্যাক্রিডিটেড-এর ব্যবস্থাকরণ।	এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থায় মানসম্মত সেমি-প্রসেসড্ শস্যজাত পণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ; এবং	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কৃষি মন্ত্রণালয়।
২.	গমের চাষ বৃদ্ধি উৎসাহিতকরণ।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কৃষি মন্ত্রণালয়।

৮.২ মসলাঃ মসলা বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল । Ready to Eat পর্যায়ের খাদ্য উৎপাদনে প্রতিটি দেশেই মসলার ব্যবহার দৃশ্যমান। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫.৪২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৩১.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন মশলা জাতীয় পণ্য যেমন পেয়াজ, রসুন, ধনিয়া, আদা, মরিচ, হলুদ ইত্যাদি উৎপাদিত হয়েছে। হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৬.২২ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে উৎপাদিত হয় এমন বেশ কয়েকটি মসলা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন দ্বারা অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ সম্ভব হচ্ছে না । যার কারণে দেশে উৎপাদিত হয় এমন কিছু মসলা আমদানি করে চাহিদা পূরণ করতে হয়। এছাড়া কিছু মসলা বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় না। এসব জাতের মসলার পুরোটাই আমদানি করে চাহিদা পূরণ করতে হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশে মসলা বাবদ আমদানি ব্যয় ছিল ১৬৬.১মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ অবস্থায়, বাংলাদেশ হতে মসলা রপ্তানির বিষয়টি বিবেচনার খুব একটা অবকাশ রয়েছে বলে মনে হয় না। রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ এ পিয়াজ রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য। তবে দেশের বৃহত্তর খাদ্য পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ কিছু পরিমানে মসলা রপ্তানি করে থাকে। ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে বিশ্বে মসলার আমদানির পরিমান ছিল যথাক্রমে ৫৮,৩৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৫৫,০৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৫২,৮৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৫৫,৪৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, এবং ৫৫,০১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে বাংলাদেশে মসলার রপ্তানির পরিমান ছিল যথাক্রমে ১১.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৭.৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২৫.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, এবং ১১.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মসলার বিশ্ব বাজার এবং বাংলাদেশি মসলার রপ্তানি এর ব্যাপক পার্থক্য সম্পর্কিত অবস্থা নিম্নের তথ্য চিত্রে দেখানো হলোঃ

তথ্য চিত্র-০৪

Value in million US$

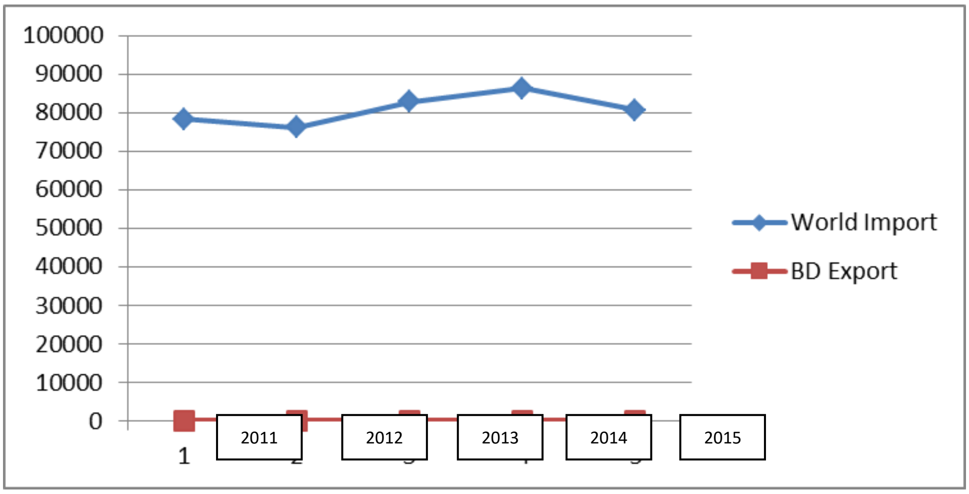

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং আইটিসি ট্রেড ম্যাপ

উপরে বর্ণিত তথ্য চিত্রে প্রতিয়মান হয় যে, মসলার আন্তর্জাতিক বাজার রয়েছে। তবে উৎপাদনগত সীমাবদ্ধতার কারণে মসলার রপ্তানি সম্প্রসারণের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

৮.২.১ সমস্যাঃ

১. চাহিদার তুলনায় বাংলাদেশে অধিকাংশ মসলার উৎপাদন কম এবং কিছু কিছু মসলা উৎপন্ন হয়না;
২. সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজের অভাব;
৩. বাংলাদেশে মসলার উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলক ভাবে বেশী বিধায় দেশে উৎপাদিত মসলার মূল্য প্রতিযোগিতামূলক না হওয়ায় কৃষকগণ মসলা চাষে অনুৎসাহী; এবং
৪. মসলার দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ সুবিধার অভাব।

৮.২.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	**বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান**
১.	উন্নত বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ; এবং	বিএডিসি ও কৃষি মন্ত্রণালয়।
২.	স্বল্প সুদে ঋণ দান, মসলা চাষীদের মসলা চাষে ব্যবহৃত কৃষি উপকরণের উপর ভর্তুকীর মাধ্যমে মসলা চাষে কৃষকবৃন্দকে উৎসাহিতকরণ।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কৃষি মন্ত্রণালয়।

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	কৃষকদের মসলার প্রি ও পোষ্ট হার্ভেস্টিং কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া;	কৃষি মন্ত্রণালয়।
২.	মসলা উৎপাদন উপযোগী এলাকা চিহ্নিত করে Crop zoning map প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী মসলা উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ। এক্ষেত্রে যে সব এলাকায় উৎপাদিত মসলায় হেভী মেটালের উপস্থিতি বিদ্যমান সে সব এলাকাকে map বর্হিভূতকরণ। এ বিষয়ে প্রয়োজনে প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে জমিতে হেভী মেটাল এর পরিমান সহনীয় পর্যায়ে আনয়ন; এবং	কৃষি মন্ত্রণালয়।
৩.	বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী উন্নত ফলনশীল জাতের মসলার উদ্ভাবন ও উদ্ভাবিত মসলার চাষ সম্প্রসারণ।	হর্টিকালচার বিভাগ।

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

১.	মসলার দীর্ঘ স্থায়ী সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির প্রয়োগ। প্রয়োজনে পরমানু শক্তি কমিশনের সুবিধাদি কাজে লাগানো। এক্ষেত্রে পরমানু শক্তি কেন্দ্রের সুবিধা বাণিজ্যিক চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ করা; এবং	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও পরমানু শক্তি কেন্দ্র।
২.	মসলার উচ্চ ফলন, উন্নত জাত ও উন্নত মান নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কৃষি মন্ত্রণালয়।

৮.৩ **পোল্ট্রিজাত খাদ্যঃ** হালকা প্রযুক্তি ও স্বল্প পুঁজির খাত হিসেবে পোল্ট্রিজাত পণ্য খাতে বাংলাদেশের সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল। অতীতে এটি শিল্প হিসেবে বিবেচিত ছিল না। এ দেশে নিজ প্রয়োজনে হাঁস-মুরগি পালনের প্রচলন বহু পুরোনো। সাধারণ মানুষ নিজ প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ বাজারে বিক্রি করতো। কিছু কৃষক পরিবার বাড়তি আয় অর্জনের লক্ষ্যে হাঁস-মুরগি পালন করত। তবে বর্তমানে ক্ষুদ্র শিল্প আকারে পোল্ট্রি খাত এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রাথমিক পণ্য হিসেবে বাণিজ্যের পাশাপাশি সাম্প্রতিক কয়েক বছর থেকে Ready to Eat পর্যায়ের পোল্ট্রি সামগ্রী তৈরি ও স্থানীয় বাজারে বিপণন হচ্ছে । রাজধানী ঢাকাসহ ২/৩ টি বড় বিভাগীয় শহরে শুধুমাত্র পোল্ট্রি নির্ভর রেষ্টুরেন্ট পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে তেমন কোন পোল্ট্রি সামগ্রী রপ্তানি হচ্ছে না। ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে বিশ্বে পোল্ট্রি সামগ্রির মোট বিশ্ব বাণিজ্য ছিল ২৬.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২৬.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২৭.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২৮.০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২৪.৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বে পোল্ট্রি সামগ্রির প্রধান প্রধান আমদানিকারক দেশসমূহ হচ্ছে ইউএসএ, জাপান, চীন, জার্মানি, ইউকে, হংকং, ফ্রান্স, ইটালী, নেদারল্যান্ড ও ভিয়েতনাম ইত্যাদি।

বাংলাদেশে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে পোল্ট্রি খাত থেকে ১১.০০ বিলিয়ন ডিম এবং ২৩.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন মাংস পাওয়া যায় যা বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট মাংসের ৪০%। এটি দেশে মাংসের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহৎ খাত। বাংলাদেশে বিগত ৫ বছরের হাঁস মুরগীর ডিম ও মাংসের উৎপাদন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলঃ

সারণী-০৯

অর্থ বছর	ডিম এর উৎপাদন (বিঃ সংখ্যায়)	পোল্ট্রি মাংসের উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)
২০১০-২০১১	৬.০৭	৭.৯৬
২০১১-২০১২	৭.৩০	৯.৩২
২০১২-২০১৩	৭.৬১	১৪.৪৮
২০১৩-২০১৪	১০.১৬	১৮.০৮
২০১৪-২০১৫	১১.০০	২৩.৪৫

উৎসঃ ডিপার্টমেনট অব লাইভষ্টক সার্ভিসেস

বাংলাদেশে Ready to Eat পর্যায়ের পোল্ট্রি ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পপণ্য উৎপাদনের মূল সমস্যা তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশে উৎপাদিত হাঁস মুরগীর মাংস ও ডিমের উচ্চ মূল্য। বিনিয়োগ ঘাটতি, নেতিবাচক প্রচারণা, সীমিত অভ্যন্তরীণ বাজার ইত্যাদি এ খাতের বাণিজ্য সম্প্রসারণের অন্তরায়। খাদ্য মান এ খাতের অপর এক বড় সমস্যা । হাঁস ও মুরগী পালনে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক পোল্ট্রী খাদ্য ব্যবহারের কারণে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদকদের কিছু প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ট্যানারীর বর্জ্য থেকে আরম্ভ করে পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদনে বিবিধ ক্ষতিকর উপাদান (কাঁচামাল) ব্যবহারের তথ্যও প্রচারিত হয়। পোল্ট্রি পালনে ঔষধের ব্যবহারও অনেক ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত থাকে।

ঔষধ প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলো রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়োগ করে ঔষধের বিক্রয় বৃদ্ধি করে। তাদের নিকট স্বাস্থ্যের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। বাংলাদেশে প্রচলিত ঔষধের মান ও মূল্য উভয়ই নিয়ন্ত্রণহীন। পোল্ট্রি খাদ্যের এ অবস্থা মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি চরম পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। হাঁস মুরগীর দাম মূলতঃ নির্ভর করে পোল্ট্রি খাদ্যের উপর। এদেশে পোল্ট্রি খাদ্যের কাঁচামালের মূল উপাদান হচ্ছে ভুট্টা। ভুট্টার বাজার মূলত: নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যস্বত্ব ভোগীরা । যার কারণে মধ্যস্বত্ব ভোগীরা বেশী লাভবান হয়। কৃষক ও ব্যবহারকারী কেউই তেমন লাভবান হয় না। এসব ক্ষেত্রে সরকারের সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। পোল্ট্রি মান ও মূল্যের দিক থেকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা নিশ্চিত করতে সক্ষম হলে অতি সহজেই ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পোল্ট্রি সংশ্লিষ্ট খাদ্যের বাজারে বাংলাদেশ প্রবেশের সক্ষমতা অর্জন করবে। পোল্ট্রি ভিত্তিক খাদ্য উৎপাদনে সর্বজন গ্রহণীয় মান নির্ধারণ এবং তা প্রতিপালন বাধ্যতামূলক করতে হবে। ভ্যালু চেইনের প্রতিটি স্তরে উৎপাদনকারী শিল্পের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি মুসলমানের হাঁস মুরগীর হালাল মাংসের বাজারে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে। এসব বিবেচনায় বাংলাদেশে পোল্ট্রি সংশ্লিষ্ট খাদ্য শিল্পের সম্ভাবনা অত্যন্ত ব্যাপক। এর মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অধিক পরিমান কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৮.৩.১ সমস্যাঃ

১. বাংলাদেশে পোল্ট্রি খাতের বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ;
২. পোল্ট্রি পালনের পোল্ট্রি খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উদ্যোক্তাবৃন্দের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা;
৩. পোল্ট্রি খাদ্যের মূল্যবেশী এবং অনিয়ন্ত্রিত মান;
৪. হাঁস ও মুরগী পালনে অস্বাস্থ্যকর ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক পোল্ট্রি খাদ্য ব্যবহার;
৫. পোল্ট্রি পালনে এন্টিবায়োটিকসহ ক্ষতিকর ঔষধের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার;
৬. বাংলাদেশে প্রচলিত ঔষধের মান ও মূল্য উভয়ই নিয়ন্ত্রণহীন;
৭. জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদি বিবেচনায় না নিয়ে ঔষধ প্রস্তুতকারক কোম্পানী কর্তৃক রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়োগের মাধ্যমে ঔষধের বিক্রয় বৃদ্ধি;
৮. পোল্ট্রি মাংস উৎপাদনে গুণগত মানের অনুপস্থিতি এবং নির্ধারিত গুণগত মানের পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের অনীহা;
৯. হিমায়িত মাংসের সীমিত অভ্যন্তরীণ বাজার এবং সুষ্ঠু প্রক্রিয়াকরণ, নিরাপদ প্যাকেজিং, পরিবহন এবং সংরক্ষণ সুবিধাদি/ অবকাঠামো ও প্রযুক্তির অভাব; এবং
১০. বাংলাদেশি পোল্ট্রি খাতের প্রতিকূল ব্যপক প্রচারণা।

৮.৩.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	পোল্ট্রি খামারীদেরকে পোল্ট্রী খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ অনুযায়ী খামার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার বিষয়টি মনিটরিং;	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং ডিপার্টমেন্ট অব লাইভ ষ্টক সার্ভিসেস।
২.	মানসম্পন্ন পোল্ট্রী খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যের সরবরাহ বিএসটিআই-এর বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশনের আওতায় আনয়ন। বিএসটিআই-এর সার্টিফিকেশন ব্যতিরেকে পোল্ট্রী খাদ্যের বিপণন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধকরণ;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বিএসটিআই।
৩.	খামারীদের স্ব-উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত খাদ্যের ক্ষেত্রে পোল্ট্রি খাদ্য মান বিএসটিআই মানের সমপর্যায়ে হওয়া বাধ্যতামূলককরণ;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ডিপার্টমেন্ট অব লাইভ স্টক সার্ভিসেস।
৪.	পশু, হাঁস, মুরগী ও মাছ চাষে রোগ প্রতিরোধমূলক ও মোটাতাজাকরণে এন্টিবায়োটিকসহ ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধকরণ এবং তা নিশ্চিতকরণ; এবং	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও ডিপার্টমেন্ট অব লাইভ স্টক সার্ভিসেস।
৫.	পোল্ট্রি কৃষির একটি উপ-খাত বিবেচনায় খাতটিকে শুল্ক, কর ও ভ্যাট বর্হিভূতকরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ডিএলএস এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	পোল্ট্রিসহ উপ-খাতের ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় ঔষধ বাংলাদেশে বিপণনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ বাধ্যতামূলককরণ, মূল্য সুনির্দিষ্টকরণ এবং প্রয়োজনে পৃথক একটি কর্তৃপক্ষ গঠন;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

২.	পোল্ট্রির মান ও পরিমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৩.	বাংলাদেশে উৎপাদিত সকল প্রকার পোল্ট্রিজাত খাদ্য এবং খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানের (পোল্ট্রির মাংস) মান ও পোল্ট্রি পালনে মান সম্পন্ন ঔষধ, কীটনাশক এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য USFDA-এর ন্যায় বাংলাদেশে Food and Drug Authority গঠন;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
৪.	পশুর নাড়ীভুঁড়িসহ খাদ্য উপকরণের বর্জ্য থেকে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রিরর স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন/সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;	মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, ডিএলএস এবং সংশ্লিষ্ট সমিতি।
৫.	পোল্ট্রিসহ খাদ্য শিল্পের বিকাশ ও রপ্তানি উন্নয়নে Production Chain-এর প্রতিটি স্তরের Traceability নিশ্চিতকরণের বিষয়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ;	মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
৬.	পোল্ট্রিজাত খাদ্য উৎপাদনে দেশে সর্বজন গ্রহণীয় মান নির্ধারণ এবং তা প্রতিপালন বাধ্যতামূলককরণ;	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
৭.	পোল্ট্রি মাংসের উৎপাদন, সুষ্ঠুভাবে প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, পরিবহন এবং সংরক্ষণের বিষয়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়।
৮.	খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় Cool-chain ব্যবহার অনুসরণের বাধ্যবাধকতা আরোপ; এবং	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৯.	পোল্ট্রি খামারী ও পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদকদের সমন্বয়ে Contact Production ব্যবস্থাপনায় হাঁস-মুরগী পালনে উদ্বুদ্ধকরণ।	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ।

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

১.	Animal Diseased Free Zone প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ডিপার্টমেন্ট অব লাইভ স্টক সার্ভিসেস।
২.	পোল্ট্রিজাত খাদ্যের নিরাপদ সংরক্ষণ ও পরিবহনের জন্য Food Graded Export Oriented Packaging Material Industry এর প্রতিষ্ঠা।	শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিনিয়োগ বোর্ড।
৩.	পোল্ট্রীর উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা এবং পণ্যের মান বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে পোল্ট্রি সামগ্রী রপ্তানির অনুকূল ইমেজ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ; এবং	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৪.	পোল্ট্রী খাতের ঝুঁকি নিবারনের লক্ষ্যে পোল্ট্রী বীমা চালুকরণ।	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং ডিপার্টমেন্ট অব লাইভ স্টক সার্ভিসেস

৮.৪ ডেইরীঃ গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি ডেইরী পণ্যের অন্যতম উৎস। এ দেশে গবাদি পশু পালনের ইতিহাস অতি প্রাচীন। চাষাবাদ, পণ্য পরিবহন, দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রাচীন কাল থেকেই এদেশে গরু পালন হয়ে আসছে। আমিষের চাহিদা পূরণ এবং বাড়তি আয়ের প্রয়োজনে এদেশের কৃষক পরিবার ছাগল-ভেড়া পালন করে থাকে। বর্তমানে চারণ ভূমির স্বল্পতার কারণে দেশের ডেইরী খাত বেশ সমস্যার মধ্যে রয়েছে। তবে দেশে এ ক্ষেত্রে ব্যাপক চাহিদা থাকায় শত সীমাবদ্ধতা সত্বেও এ খাতের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে এবং বেশ কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সফলতাও লাভ করেছে। ডেইরী খাদ্যের মূল উপাদান গবাদি পশু পালনে স্বাস্থ্য হানিকর ঔষধ ও খাদ্য ব্যবহার করা হচ্ছে। মানসম্পন্ন ডেইরী পণ্যের উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসব সমস্যা দুর করা প্রয়োজন।

অন্যান্য মূল্য সংযোজিত কৃষিজ পণ্য যেমন-ফল ও শাক-সব্জি, মাংস, মাছ ইত্যাদির অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও যোগান বৃদ্ধি পেলেও ডেইরী পণ্য এখনও স্থানীয় চাহিদা পূরণে সক্ষম নয়। ডেইরী খাত দেশের প্রোটিনের ২৪ শতাংশ পূরণ করে থাকে। যদিও দেশে উৎপাদিত মোট ৫৮.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন মাংসের শতকরা ৬০ ভাগের যোগানদাতা হচ্ছে দেশের ডেইরী খাত। বিগত ২ বছর আগেও মাংসের যোগান আমদানিকৃত গরু-মহিষ কর্তৃক পূরণ করা হত। তবে বিগত ২ বছরের চেষ্টায় নিজস্ব গরু, মহিষ, ছাগল, দ্বারা অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ খাত এখনও প্রক্রিয়াজাত ডেইরী সামগ্রী উৎপাদন উপযোগী চাহিদা পূরণে সক্ষম নয়। গবাদি পশু নির্ভর খাদ্য উৎপাদনে মূল সমস্যা গবাদি পশু গরু, ছাগল ও মহিষ-এর ঘাটতি।

এছাড়াও ডেইরী ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্রতিপালনে অবহেলা, নিম্নমানের ষ্ট্যান্ডার্ড এবং দুর্বল পরীক্ষাগার ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবার অভাব রয়েছে। ডেইরী সংশ্লিষ্ঠ খাদ্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে বাংলাদেশকে বিদেশের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ ডেইরী পণ্য যেমন: দুধ, মাংস, দুগ্ধজাত সামগ্রী ইত্যাদির অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, আমদানি ও চাহিদা নিম্নরুপ:

সারণী-১০

অর্থ বছর	ডেইরী মাংসের উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)	দুগ্ধ উৎপাদন	দুগ্ধের চাহিদা	ঘাটতি
২০১০-২০১১	১১.৯৪	২৯.৫	১৪৬.৯০	৭২.৪০
২০১১-২০১২	১৩.৯৮	৩৪.৬		
২০১২-২০১৩	২১.৭২	৫০.৭		
২০১৩-২০১৪	২৭.১৩	৬০.৯		
২০১৪-২০১৫	৩৫.১৭	৬৯.৭		

উৎসঃ ডিপার্টমেনট অব লাইভষ্টক সার্ভিসেস

বাংলাদেশে বর্তমানে দুধের চাহিদা, উৎপাদন ও ঘাটতি নিম্নের তথ্যচিত্রে দেখানো হলোঃ

তথ্যচিত্রঃ ০৫

Value in million US$

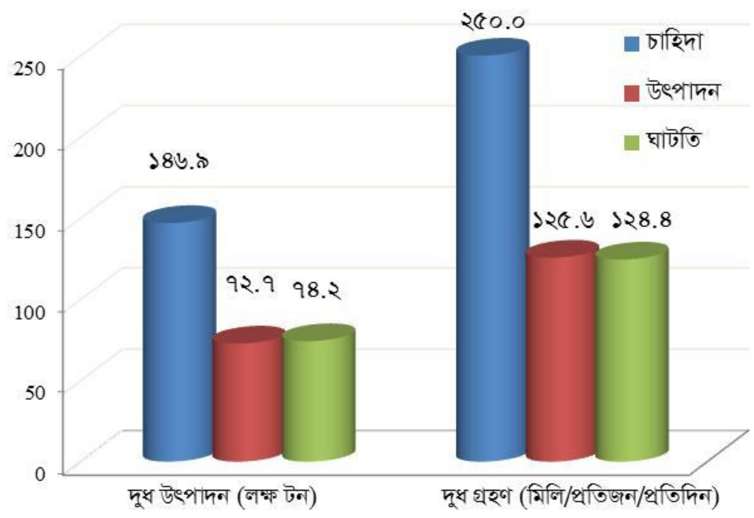

উৎসঃ ডিপার্টমেনট অব লাইভষ্টক সার্ভিসেস

বিশ্বে ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে যথাক্রমে ১,৮১,৫০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১,৮২,৫৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১,৯৭,৯৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২,১১,৪৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১,৭৯,১৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ডেইরী পণ্য রপ্তানি হয়েছে। বিশ্বের এ চাহিদার বিপরীতে বাংলাদেশের অবস্থান শূন্য।

বেঙ্গল মিটসহ ২/১টি প্রতিষ্ঠান Ready to Cook পর্যায়ের হিমায়িত মাংসসহ ডেইরী খাদ্য রপ্তানির জন্য সীমিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের কাঁচামালের সরবরাহ ও যোগান নিশ্চিত সম্ভব না হলে ডেইরী সামগ্রী রপ্তানি বাজারে প্রবেশ দূরহ। এ অবস্থায় রপ্তানির লক্ষ্য নিয়ে ডেইরী নির্ভর খাদ্য শিল্প সম্প্রসারণের বিষয়টি খুব একটা যুক্তিযুক্ত হবে না। ২০০১ সালে যুক্তরাজ্যে ম্যাড কাউজনিত সমস্যা দেখা দেয়। গরুর মাংসসহ ও অন্যান্য সামগ্রীর বিশ্ব বাণিজ্যে Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) মুক্ত হিসেবে রপ্তানিকারক দেশসমূহের ঘোষণা মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ পর্যায়ে ওয়াল্ড এ্যানিমেল হেলথ অর্গানাইজেশন কর্তৃক বিশ্বের প্রতিটি দেশকে ঝুঁকিমুক্ত, ঝুঁকিযুক্ত এবং ঝুঁকি অনির্ধারিত হিসেবে বিভাজন করা হয়। বাংলাদেশ ঝুঁকি অনির্ধারিত দেশের তালিকাভূক্ত হিসেবে ৫ বছরের মধ্যে ঝুঁকিমুক্ত হিসেবে ঘোষণার সুযোগ পায়। কিন্তু উক্ত সময়ে এমনকি এখন পর্যন্ত উক্ত সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ঝুঁকি মুক্ত হিসেবে ঘোষণা করতে সক্ষম হয় নাই। যার কারণে গরুর হাড়ের গুড়াসহ ডেইরী সামগ্রী বাংলাদেশ থেকে রপ্তানির ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রায় সবকটি হাড়ের গুড়া ফ্যাক্টরী উৎপাদন বন্ধ করতে বাধ্য হয়। অনেক দেশেই বাংলাদেশ থেকে ডেইরী সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে BSE মুক্ত Status-এর অবস্থা যাচাই করে থাকে। বাংলাদেশ হতে ডেইরী সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে এরূপ সমস্যাদির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গরুর নাড়ী ভুড়ি অনেক দেশে সরাসরি খাদ্য, সসেজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশ থেকে

বর্তমানে গরুর নাড়ীভূড়ি মূলতঃ চীনে রপ্তানি হচ্ছে। সরকার এ পণ্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তাও প্রদান করছে। কিন্তু হাইজেনিক অবস্থায় পণ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতের বিষয়টি উপেক্ষিত রয়েছে। যার কারণে একদিকে অপচয়ের পরিমান বেশী হচ্ছে এবং যে কোন সময় স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টির অজুহাতে বাংলাদেশ থেকে নাড়ীভূড়ি রপ্তানি বন্ধ হতে পারে। এমনকি ডেইরী সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে যা হয়তবা কম্পোজিট ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ-এ ডেইরী সামগ্রী ব্যবহারে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ঔষধের মান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান। কিন্তু গবাদি পশু, হাঁস-মুরগীর জীবন রক্ষাকারী ঔষধের মান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। এ সুযোগে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যহানিকর ঔষধ অনিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। এতে একদিনে গবাদি পশু নির্ভর মান সম্পন্ন খাদ্যের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে গবাদি পশু পালন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে যা পোল্ট্রি ও ডেইরীজাত খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বিবেচিত। আন্তর্জাতিক বাজারের এসব সমস্যা, দেশে গবাদি পশুর ঘাটতির বিষয়াদি বিবেচনা করে অভ্যন্তরীণ বাজার চাহিদা পূরণ উপযোগী কিছু গবাদি পশু নির্ভর খাদ্য শিল্প দেশে গড়ে উঠতে পারে।

৮.৪.১ সমস্যাঃ

১. চারণ ভূমির অভাব;
২. গবাদি পশু গরু ছাগল, মহিষ-এর ঘাটতি;
৩. ডেইরী ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্রতিপালনে অবহেলা;
৪. নিম্নমানের ষ্ট্যান্ডার্ড এবং দুর্বল পরীক্ষাগার ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবার অভাব রয়েছে;
৫. অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে আমদানি নির্ভরতা;
৬. ডেইরী খাদ্যের মূল উপাদান গবাদি পশু পালনে স্বাস্থ্য হানিকর ঔষধ ও খাদ্য ব্যবহার;
৭. ডেইরী সামগ্রী (গরুর হাড়ের গুঁড়াসহ) রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ফ্রি হিসেবে ঘোষণার ক্ষেত্রে অবকাঠামো, ঔষধ, চিকিৎসক ইত্যাদির অভাব; এবং
৮. গরুর নাড়ীভূঁড়ি হাইজেনিক অবস্থায় সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতের বিষয়টি উপেক্ষিত।

৮.৪.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	ডেইরী খাদ্যের মূল উপাদান গবাদি পশু পালনে স্বাস্থ্য হানিকর ঔষধ ও খাদ্য ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধকরণ এবং তা নিশ্চিতকরণ; এবং	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
২.	গরুর নাড়ীভূঁড়ি হাইজেনিক অবস্থায় সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, নিরাপদ সংরক্ষণ এবং পরিবহন বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ।

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	ট্যাক্স হলিডে, স্বল্পসুদে সরলীকরণকৃত প্রক্রিয়ায় ঋণ প্রদান ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজার চাহিদা পূরণ উপযোগী ডেইরী খাদ্য শিল্প দেশে গড়ার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাবৃন্দকে উৎসাহিতকরণ;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়।
২.	ডেইরী খামারীদেরকে খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্রতিপালনে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিতকরণ; এবং	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়।
৩.	ডেইরী সামগ্রী (গরুর হাড়ের গুড়াসহ) রপ্তানির লক্ষ্যে বাংলাদেশকে Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) মুক্ত হিসেবে ঘোষণার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

১.	আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণীয় পণ্যমান নির্ধারণ এবং পর্যাপ্ত পরীক্ষণ সুবিধা সম্বলিত পরীক্ষাগার ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সৃষ্টিকরণ; এবং	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়।
২.	গবাদি পশুর অভ্যন্তরীণ যোগান বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা হ্রাসকরণ।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়।

৮.৫ লবণঃ সমুদ্র বেষ্ঠিত বাংলাদেশ লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্য প্রস্তুতের ক্ষেত্রে লবণ একটি অপরিহার্য উপাদান। বাংলাদেশে খাবার লবণের বাৎসরিক চাহিদা ১.৩৩ মিলিয়ন টন এবং উৎপাদন ১.৭৪ মিলিয়ন টন। দেশে ২০১৬ সালে লবণ চাষে ব্যবহৃত জমির পরিমান ৬০,১৩০ একর। অর্থনীতিতে দেশের লবণ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। পণ্যটি বাংলাদেশের Essential Product তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পণ্যটি ফুটপাতের মানুষ থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ শ্রেণীর সকল মানুষের জন্য আবশ্যকীয়। বাংলাদেশে ক্রুড লবণ এর উৎপাদন ব্যয় ১২.১০ টাকা যা প্রক্রিয়াজাত অবস্থায় মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে খুচরা মূল্য প্রতি কেজি ২৫/৩০ টাকায় বিক্রি হয়। ভারত এবং পাকিস্তানে এক কেজি লবণের খুচরা মূল্য যথাক্রমে বাংলাদেশি মূদ্রায় ২০ টাকা এবং ১৯ টাকা। অপ্রক্রিয়াজাত ও প্রক্রিয়াজাত লবণের মূল্যগত পার্থক্য হ্রাস করা সম্ভব হলে বাংলাদেশ থেকে লবণ রপ্তানি করা সম্ভব হতে পারে বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রান্তিক চাষী পর্যায়ে ক্রুড লবণের মূল্য প্রতিকেজি ৩ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। অবস্থাভেদে লবণের মূল্যগত পার্থক্যের বিষয়টি ভ্যালু চেইন এর প্রতিটি স্তর পর্যালোচনাপূর্বক প্রকৃত অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক বলে মনে হয়। এতে করে পণ্যের রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। বিশ্বে ২০১৫ সালে লবণের মোট আমদানি ছিল ৩.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং রপ্তানির পরিমান ছিল ২.৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বে লবণের প্রধান প্রধান আমদানিকারক দেশসমূহ হচ্ছে- ইউএসএ, জাপান, চীন, কোরিয়া, জার্মানী, বেলজিয়াম, কানাডা, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইউকে ইত্যাদি এবং প্রধান প্রধান রপ্তানিকারক দেশসমূহ হচ্ছে নেদারল্যান্ড, জার্মানী, চিলি, কানাডা, মেক্সিকো, ইউএসএ, ভারত ইত্যাদি।

৮.৫.১ সমস্যাঃ

১. বাংলাদেশে লবণ প্রক্রিয়াকরণ ব্যয় অনেক বেশী ;
২. লবণ চাষীদেরকে প্রশিক্ষণের অভাব;
৩. অনুন্নত লবণ আহরণ প্রক্রিয়া; এবং
৪. অপ্রক্রিয়াজাত এবং প্রক্রিয়াজাত লবণের মূল্যগত পার্থক্য অনেক বেশী।

৮.৫.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	অপ্রক্রিয়াজাত ও প্রক্রিয়াজাত লবণের মূল্যগত পার্থক্য হ্রাস করে অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে উৎপাদন চেইনের প্রতিটি স্তর পর্যালোচনাপূর্বক মূল্য হ্রাসের উপায়সমূহ নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন।	বিসিক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	লবণ চাষ এলাকা সম্প্রসারণ ;	বিসিক ও শিল্প মন্ত্রণালয়।
২.	লবণ চাষীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং	বিসিক ও শিল্প মন্ত্রণালয়।
৩.	লবণ আহরণ প্রক্রিয়া আধুনিকীকরণ।	বিসিক ও শিল্প মন্ত্রণালয়।

৯. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাত পণ্যঃ অতীতে বাংলাদেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সকল প্রকার খাদ্য পণ্যই অপ্রক্রিয়াজাত অবস্থায় বেচা-কেনা হতো। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, খাদ্যের ঘাটতি ইত্যাদি বিবিধ কারণে খাদ্য বাণিজ্যের পরিধি বৃদ্ধি পায়। খাদ্য মান সংরক্ষণ, সহজলভ্য পরিবহন ইত্যাদি কারণে খাদ্য বাণিজ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সূত্রপাত ঘটে। বর্তমান সময়ে মানুষের চরম কর্মব্যস্ততা মানুষকে ব্যাপকভাবে প্রক্রিয়াকৃত খাদ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জীবন ধারণের প্রয়োজনে মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। এজন্য খাদ্য পণ্যের মান ও মূল্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খাদ্য মান ও মূল্যের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে ক্রেতা সাধারণের আস্থা অর্জন করতে হবে। আস্থা অর্জন ব্যতিরেকে খাদ্য বাণিজ্যে টিকে থাকার কোন সুযোগ নেই। বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে ক্রেতার আস্থা অর্জনে প্রয়োজন সর্বজন গ্রহণীয় (এ্যাকরিটিটেড) মান সনদ। সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে সর্বজন গ্রহণীয় মান সনদ প্রদান অবকাঠামো গড়ে তোলা, গ্রহণীয় পণ্য মান নির্ধারণ এবং উক্ত পণ্য মানে পণ্য উৎপাদন এ শিল্প বিকাশের পূর্বশর্ত। এ ব্যতীত গুনগত

মানের কাঁচামালের প্রাপ্যতা, সস্তা শ্রম, প্রযুক্তিগত সহায়তা ইত্যাদি এ শিল্প বিকাশের মূখ্য নিয়ামক। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে বিদ্যমান খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাত পণ্যের বিষয়াদি নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

৯.১ শস্যজাত চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্যঃ শস্যজাত প্রাথমিক এবং সেমি-প্রসেসড্ পণ্য থেকে রুটি, বিস্কুট, নুডুলস, পাশতা, পরাটা, পাঁপড়, মাছ ও মাংসের তৈরি স্ন্যাক্স যেমন-হিমায়িত নাগেট, মিট বল, ফিস কেক, সিংগাড়া, সমুচা, সেমাই, আলুপুরী, ডালপুরী, পিঠা, মুড়ি, চিড়া, সুগন্ধি চাল, ডাল ভাজা, চানাচুর, মটরশুটি ভাজা, হালিম মিক্সড, খিচুড়ি মিক্সড ইত্যাদি চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদিত হয়। এসব খাদ্য বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে এবং তা ধীরে ধীরে সম্প্রসারণমান। তবে বাংলাদেশের এসব খাদ্য এখনো রপ্তানি বাজারে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের মূল খাবার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নাই। বাংলাদেশে মুড়ি, চিড়া, বিস্কুট ইত্যাদি কিছু শুকনো খাবার ব্যতীত অন্যান্য শস্যজাত খাদ্যাদি প্রস্তুতের পর হিমায়িত আকারে সংরক্ষণ ও বিপণন করা হচ্ছে। এখনও স্বাস্থ্য সহায়ক প্রিজারভেটিভ ব্যবহার এবং Cool Chain ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্যের সম্প্রসারিত বিপণনের উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। বর্তমানে হিমায়িত আকারে সামান্য পরিমানে এসব সামগ্রী রপ্তানিও হচ্ছে। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উৎপাদিত এসব খাদ্য সামগ্রীর মোট উৎপাদন বিষয়ক নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই। বাংলাদেশে উৎপাদিত এসব খাদ্যের ভোক্তা ভারত উপ-মহাদেশী জনগোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশে উৎপাদিত এসব খাদ্য বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠির নিকট গ্রহণীয় করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্যাপক প্রচারণা। দেশে ও দেশের বাইরে এসব পণ্যের মোট চাহিদা এবং বাংলাদেশের মোট উৎপাদন সক্ষমতা সম্পর্কিত নির্ভরশীল তথ্য-উপাত্ত নেই। তবে এইচ এস কোড-এর ১১ এবং ১৯ হেডিং-এর আওতায় এখাতে বিবিধ পণ্য রয়েছে এবং বিগত ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে এসব পণ্যের বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমান ছিল যথাক্রমে ৭৮,২৬৮.৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৭৬,০৮৫.২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৮২,৮১৪.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৮৬,২৯৪.৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ৮০,৫৭১.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে এইচ এস কোড এর হেডিং ১১ এবং ১৯-এর উল্লিখিত বছরসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমান ছিল যথাক্রমে ৩৩.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৪১.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৫৩.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৯২.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৯৮.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশে এসব খাদ্যের রপ্তানি ও বিশ্ব বাণিজ্যের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

তথ্য চিত্র-০৬

Value in million US$

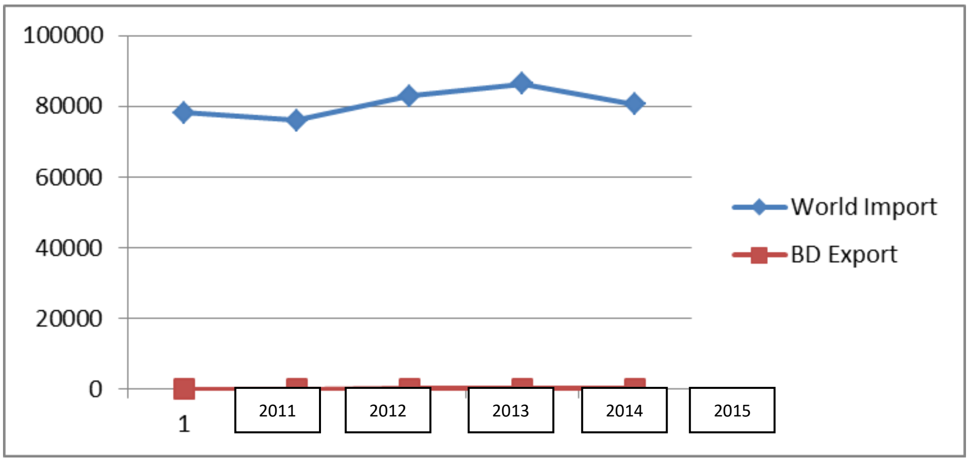

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও আইটিসি ট্রেড ম্যাপ

উপরোক্ত তথ্য চিত্রে প্রমাণিত হয় যে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য শিল্পের এ উপ-খাতে বাংলাদেশের অবস্থান নেই বললেই চলে। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং বিশ্ব আমদানির পরিমাণ বিবেচনায় নেয়া হলে এ উপ-খাত ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্ভাবনা ব্যাপক। তবে এখাতের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, এসব অনেক সামগ্রীর বাংলাদেশ মান নির্ধারিত নেই। যার কারণে বিপণন পর্যায়ে উপযুক্ত মানে পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব হচ্ছে না।

শুকনা ও হিমায়িত আকারে শস্যজাত খাদ্য সামগ্রী রপ্তানি হলেও তা মূলতঃ Ethnic community-তে বিপণন হচ্ছে। বাংলাদেশী শস্য জাতীয় খাদ্যের প্রধান প্রধান আমদানিকারক দেশসমূহ হচ্ছে ইউএই, সৌদিআরব, কানাডা, ইউকে, মালয়েশিয়া, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, কাতার, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, হংকং ইত্যাদি।

এসব সামগ্রীর Food value কি এবং কি হওয়া আবশ্যক সে সব বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কোন গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম নেই। বিসিএসআইআরসহ কিছু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কিন্তু এসব গবেষণা ফলাফলের বাণিজ্যিকীকরণে দুর্বলতার কারণে গবেষণাগারের বাইরে এসব উদ্ভাবিত পণ্যের পুরোপুরি বাণিজ্যিক উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে গবেষক এবং উদ্যোক্তাবৃন্দের আস্থাহীনতা, অংশীদারিত্ব এবং সরকারি নীতি দায়ী বলে মনে হয়। ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যের উপযোগীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমেও চরম দুর্বলতা বিদ্যমান। উদাহরণ হিসেবে বিশ্বের সকল আবাসিক হোটেলের নাস্তার একটি আইটেম কর্ণ যা অনেকটা আমাদের চিড়ার অনুরূপ। ধানের খৈ এরও সম্ভাবনাও রয়েছে অভিজাত নাস্তার আইটেম হিসেবে অন্তর্ভুক্তির। কিন্ত এসব উদ্ভাবন নিয়ে কোন পর্যায়েই তেমন কোন কাজ হচ্ছে না। প্যাকেজিং এক্ষেত্রে আরেক দুর্বলতা। দেশে বিদ্যমান খাদ্য সামগ্রীতে ব্যবহৃত প্যাকেজিং সামগ্রীর অধিকাংশই User friendly নয়। প্যাকেজিং এর আবরণ পার হয়ে খাদ্যস্তরে পৌঁছতে কোন কোন ক্ষেত্রে হাত ও দাঁত উভয়ই ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে। Ready to Eat পর্যায়ের খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ক্ষতির হাত হতে রক্ষা, দ্রুত পঁচন রোধ এবং মান অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে উপযুক্ত মানের প্যাকেজিং সামগ্রী আবশ্যক এবং তা User friendly হতে হবে বিধায় খাদ্য শিল্পের সহায়ক হিসেবে বাংলাদেশে প্যাকেজিং শিল্প গড়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশে উৎপাদিত শস্যজাত খাদ্য সামগ্রীর Ready to Eat পর্যায়ে প্রধান খাদ্য হিসেবে অর্ন্তভুক্তির ব্যাপক সম্ভাবনা বিদ্যমান। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তবে প্রয়োজন গুনগত মানের সুষম খাদ্য উৎপাদন ও উদ্যমী বিপণন কার্যক্রম গ্রহণ। এজন্য শস্য, মাছ, মাংস ও শাক সজির সমন্বয়ে মানুষের দৈহিক চাহিদা অনুযায়ী সুষম খাদ্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। আশা করা যায় সরকার, উদ্যোক্তা ও গবেষকবৃন্দের সমন্বিত প্রয়াসে বাংলাদেশে এরূপ কম্পোজিট ফুড ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠবে।

৯.১.১ সমস্যাঃ

১. দেশে সীমিত সংখ্যক উৎপাদন প্রতিষ্ঠান;
২. দেশে কম্পোজিট খাদ্য উৎপাদন শিল্পের অভাব;
৩. প্রাথমিক ও সেমি-প্রসেসড্ কৃষি পণ্যের উৎপাদন অবস্থা, উৎপাদনে ব্যবহৃত সার-কীটনাশক এবং পোষ্ট হার্ভেস্টিং পর্যায় সম্পর্কে চূড়ান্ত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠানের অজ্ঞতা;
৪. মান সম্পন্ন কাঁচা মালের (প্রাথমিক ও সেমি-প্রসেসড্ কৃষি পণ্য) অভাব;
৫. শস্যজাত দ্রব্য হতে প্যাকেটজাত অবস্থায় তাৎক্ষনিক ভাবে খাওয়ার উপযোগী খাদ্য উৎপাদন প্রযুক্তির অভাব;
৬. স্বাস্থ্য সহায়ক প্রিজারভেটিভ ব্যবহারের পরিবর্তে অনেক উৎপাদক কর্তৃক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রিজারভেটিভ ব্যবহার;
৭. রপ্তানি বাজারের চাহিদা, রুচি, খাদ্যাভাস সম্পর্কে উৎপাদকবৃন্দের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা;
৮. উন্নত উপযোগী মানের প্যাকেজিং সামগ্রীর অভাব;
৯. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, পরিবহন এবং সংরক্ষণ অবকাঠামোর দুর্বলতা;
১০. বাংলদেশের উৎপাদিত কিছু শুকনো খাবার উৎপাদন সক্ষমতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বাজারে অজ্ঞতা;
১১. সীমিত অভ্যন্তরীণ বাজার; এবং
১২. আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যের বিপণন উন্নয়ন কার্যক্রম ও ব্যয় উভয়ই সীমিত।

৯.১.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	সার্বিক অবস্থাদি পর্যালোচনাপূর্বক স্বচ্ছ ও সরলীকরণ প্রক্রিয়ায় ইকুইটি এন্টার প্রিনিয়ার্স ফান্ডের ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে শস্যজাত খাদ্য শিল্প স্থাপনে উৎসাহিতকরণ; এবং	বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়।
২.	বয়স ভিত্তিক খাদ্য উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।	বিসিএসআইআর।

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	শস্যজাত খাদ্য উৎপাদন, প্রসেসিং, ট্রান্সপোর্টেশন, স্বাস্থ্যগত বিষয়াদি,কর্মপরিবেশ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে Good Agricultural Practice এর নীতিসমূহ অনুসরণ এবং বাংলাদেশ সরকারের নিরাপদ খাদ্য আইন বাস্তবায়নে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও প্রক্রিয়াজাতকারীদেরকে উৎসাহিতকরণ;	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ বালাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
২.	বর্হিঃবিশ্বে বাংলাদেশী শস্যজাত খাদ্যের গুণগত মান সম্পর্কে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক রপ্তানি সম্প্রসারণ; এবং	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

৩.	সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে শস্যজাত খাদ্যের বিপণন উন্নয়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ।	কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

১.	শস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থাপণার মাধ্যমে শস্য সংগ্রহ পরবর্তী পর্যায়ের Post-harvest Losses কমিয়ে চূড়ান্ত খাদ্য পণ্যের মূল্য প্রতিযোগিতামূলক করা; এবং	কৃষি মন্ত্রণালয়।
২.	দেশের সকল অঞ্চল হতে দ্রুত ও উন্নত মানের কাঁচামাল সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, পরিবহন ও বিপণনের উদ্দেশে প্রয়োজনীয় উন্নত অবকাঠামো নির্মাণ।	কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

৯.২ ফলমূলজাত পণ্যঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে সামান্য পরিমাণ ফলের রস, জ্যাম, জেলি, আচার, চাটনী, স্লাইস আকারে টিনজাত এবং ডিহাইড্রেড আকারে ফলজাত বিভিন্ন পণ্য বিপণন হচ্ছে। ফলজাত এসব পণ্যের বাৎসরিক উৎপাদন সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই । ২০১৪ সালে তাজা ফলমূল ও প্রক্রিয়াজাত ফলের বিশ্ব আমদানির পরিমান ছিল প্রায় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেখানে বাংলাদেশ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৩৮.৪৮মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ফলমূল রপ্তানি করেছে ।

বছরে সব সময় পাওয়া যায় এমন ২টি ফল থেকে এখন পর্যন্ত ফলজাত কোন পণ্য বাজারজাত করা হয় না। তবে কলা প্রক্রিয়াকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাজা পেঁপে ও কলা স্থানীয় বাজারে বিপণন সম্ভব হলেও রপ্তানি সম্ভব হয় নাই। দেশে কলা ও পেঁপে উৎপাদনে উপযুক্ত মানের উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ না করাই এর কারণ। মৌসুমী ফলসমূহ থেকে ফলজাত বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে বছরের অল্প সময় কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট সময় উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে। যার কারণে এসব শিল্পের তেমন প্রসার নেই। দেশের হেক্টর প্রতি ফলের উৎপাদন অন্যান্য দেশের তূলনায় কম। আমসহ অধিকাংশ ফল বাগান কৃষকদের হাতে থাকে না । মধ্যস্বত্বভোগীদের অধীনে চলে যায় । এতে উৎপাদিত ফলের মানগত অবস্থার তুলনায় অধিক ফলন, সস্তায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণ, সুন্দর গ্লেজ এ বিপণনের মাধ্যমে অধিক লাভবান হওয়া ইত্যাদি মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ ফল সংরক্ষরণে ফলের বিবিধ সামগ্রী উদ্ভাবন করলেও গবেষণা ফলাফলের বাণিজ্যিকীকরণের অভাব স্পষ্ট। দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, জীবনমান উন্নয়ন, রপ্তানি সম্প্রসারণের স্বার্থে গুণগত মানের ফল উৎপাদন ও ফল জাত বিভিন্ন খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে ফলজাত খাদ্য উৎপাদন, প্যাকেজিং, পরিবহন, সংরক্ষণ ইত্যাদি সুনিশ্চিত করা আবশ্যক।

৯.২.১ সমস্যাঃ

১. ফলজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অভাব;
২. বাংলাদেশে প্রায় সব ফলই মৌসুমী হওয়ায় সারাবছর শিল্পে কাঁচামালে অভাব যা পণ্য মূল্য প্রতিযোগিতার অন্তরায়;
৩. মান সম্পন্ন কাঁচামালের (ফলের) অভাব;
৪. কাঁচামালের (ফলের) উৎপাদন এবং পোষ্ট হার্ভেস্টিং পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ফলজাত খাদ্য পণ্যউৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অজ্ঞতা;
৫. কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থায় ফল উৎপাদন ও ফল প্রসেসিং কারখানায় সরবরাহের ক্ষেত্রে কৃষক ও শিল্প মালিকদের অনীহা;
৬. পুরো বছরব্যাপী বিদ্যমান ফল, কলা ও পেঁপে নির্ভর শিল্পের অভাব;
৭. ফলজাত শিল্প প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবলের অভাব;
৮. গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অভাব এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের বাণিজিকীকরণে দুর্বলতা;
৯. উন্নত মানের এবং User Friendly প্যাকেজিং- এর অভাব;
১০. মান সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ল্যাবরেটরীর অভাব ও মান সনদের গ্রহণযোগ্যতার অভাব; এবং
১১. বিপণন উন্নয়ন কার্যক্রমের অভাব।

৯.২.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা।	অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক।

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	একই শিল্পে বিবিধ মৌসুমি ফল প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা সম্বলিত ফলজাত খাদ্য উৎপাদন উপযোগী শিল্প স্থাপন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শুল্ক-ভ্যাট, ট্যাক্স ইত্যাদি বিবিধ সুবিধা প্রদান;	অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
২.	অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা বিবেচনায় বিবিধ ফলজাত খাদ্য উৎপাদনের উপযোগী পরিমানে তাজা ফল উৎপাদনে কৃষকবৃন্দকে উৎসাহিতকরণ;	শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট সমিতি এবং রপ্তানিকারক।
৩.	ফল উৎপাদনে কন্টাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থা প্রবর্তণ;	কৃষি মন্ত্রণালয়।
৪.	কলা ও পেঁপে ভিত্তিক ফল প্রসেসিং শিল্প স্থাপনে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাবৃন্দকে উৎসাহিত করণ; এবং	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়।
৫.	Good Agricultural Practice অনুসরণে উন্নত গুনগত মান-এর ফল উৎপাদন এবং নিরাপদ প্যাকেজিং পরিবহন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

১.	ফল প্রসেসিং ইন্ডাষ্ট্রিজ এর চাহিদা নির্ভর দক্ষ জনবল গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ। এ লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনোলজী বিভাগের সিলেবাস পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে উপযোগীকরণ।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বিসিএসআইআর।

৯.৩ আলু প্রক্রিয়াজাত পণ্যঃ গত এক যুগ ধরে দেশে আলু প্রক্রিয়াজাত পণ্য যেমন-চিপস, ফ্লেক্স ও আলুজাত অন্যান্য খাদ্যের উৎপাদন বাড়ছে। দেশে ২০১১ সাল থেকে ১৫টি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠান চিপস ও ফ্রেন্স ফ্রাই এবং পটেটো চিপস রপ্তানি করছে। তবে আলুজাত খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা উপযুক্ত জাতের আলুর অভাব। বাংলাদেশে উদ্ভাবিত আলুর জাত অথবা জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়কৃত আলুর জাতসমূহের ব্যবহার মূলতঃ কৃষক-এর গ্রহণযোগ্যতার উপর নির্ভর করে। যার কারণে দেশে বিভিন্ন খাতের চাহিদা উপযোগী আলুর জাতের সংখ্যা খুব সীমিত। রপ্তানি বাজারের চাহিদা উপযোগী আলুর জাত বাংলাদেশে ১/২ টি মাত্র। এর মধ্যে গ্রানুলা অন্যতম। পটেটো ফ্লেক্স, পটেটো স্টার্চ এর অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদা থাকলেও উপযোগী জাতের আলুর অভাবে প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। এছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতাও বিদ্যমান। প্রসংগত উল্লেখ্য, ভোক্তা পর্যায়ে চাহিদা (খাদ্য মানসহ বিশেষ উপাদানের অধিক বিদ্যামনতা, সাইজ, রং ইত্যাদি) নির্ভর আলুর জাত উন্নয়নে উন্নত দেশসমূহ নিয়মিতভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে রপ্তানি বাজার এবং আলুজাত পণ্য খাতের চাহিদা উপযোগী আলুর জাত সৃজনের গবেষণা কার্যক্রমের অনুপস্থিতি রয়েছে। এতে কিছু কিছু আলু বীজ আমদানিরকারক প্রতিষ্ঠান অন্য দেশের উদ্ভাবিত আলুজাত আমদানি এবং বাংলাদেশে রিলিজের ব্যবস্থা করছে। অনেক ক্ষেত্রে আমদানিকারক এর মুনাফার বিষয়টি মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। যার কারণে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে আমদানিকৃত জাতের আলু বীজের উন্নয়ন ও সরবরাহ সম্ভব হচ্ছেনা। দেশে রপ্তানিকারক অথবা আলুজাত পণ্যের চাহিদা উপযোগী আলুর জাতের সম্প্রসারণের বিষয়টি গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। এতে আলুর জাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭০-এর অধিক হলেও দেশে ভাল জাতের আলুর অভাব রয়েছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ মিশনসমূহকে সংশ্লিষ্ট করে চাহিদা নির্ভর আলুর জাত সংগ্রহ ও রিলিজ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক বলে মনে হয়।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য মতে বাংলাদেশে ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে আলু ও আলুজাত বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানির পরিমান ছিল যথাক্রমে ১৭.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৬.৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৫.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৪৩.৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৯.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে প্রকাশিত তথ্য মতে আলু ও আলুজাত বিভিন্ন সামগ্রীর বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমান ছিল যথাক্রমে ৯,৪১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৮,৩১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৯,৬৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৯,০৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৮,০৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ থেকে আলু ও আলুজাত পণ্যের বিশ্ব আমিদানি সংক্রান্ত তথ্যচিত্র নিম্নে দেয়া হলোঃ

তথ্য চিত্র-০৭

Value in million US$

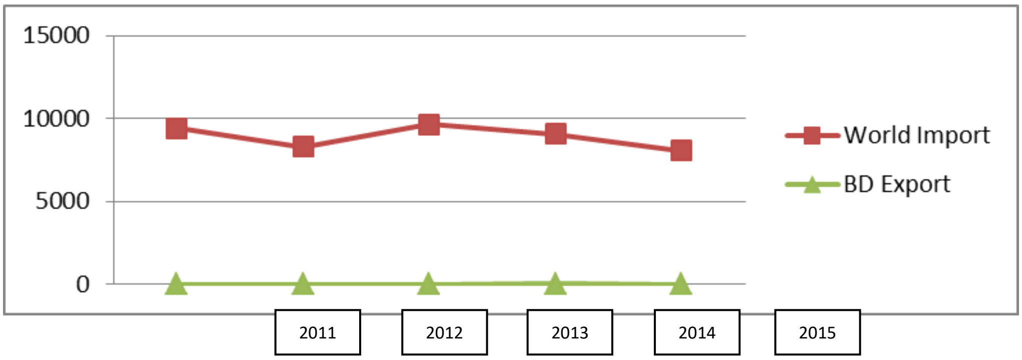

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবংআইটিসি ট্রেড ম্যাপ

উপরোক্ত তথ্যচিত্রে প্রতীয়মান হয় যে, আলু এবং আলুজাত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। রপ্তানি বাজার চাহিদা উপযোগী আলুর জাত উদ্ভাবন, আমদানি, দেশে চাষের জন্য রিলিজ প্রদানের মাধ্যমে চাষ বৃদ্ধি ও রপ্তানি সম্প্রসারণে সুযোগ বিদ্যমান।

৯.৩.১ সমস্যাঃ

১. আলুজাত খাদ্য প্রসেসিং শিল্পের অভাব;
২. আলু প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য উৎপাদনের মূল কাঁচামাল উপযোগী জাতের আলুর অভাব;
৩. আলু উৎপাদন মৌসুমের পরবর্তী সময়ে আলুর উচ্চ মূল্য বৃদ্ধি;
৪. প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবলের অভাব;
৫. পুঁজি বিনিয়োগে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনীহা;
৬. পুঁজির উচ্চ সুদহার; এবং
৭. বিপণন উন্নয়ন কার্যক্রমের অভাব।

৯.৩.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	আলুজাত খাদ্য উৎপাদনে চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থায় উপযোগী জাতের আলুর উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
২.	আলুজাত খাদ্য প্রসেসিং শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে স্বল্প সুদে মূলধন সরবরাহ এবং ট্যাক্স হলিডেসহ বিবিধ সুবিধা প্রদান;	অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক
৩.	আলুজাত সামগ্রী উৎপাদনের লক্ষ্যে ইকুইটি ইন্টারপ্রিনিয়ারশীপ ফান্ড ব্যবহারে দুর্বলতা বিশ্লেষণপূর্বক এখাতে পুঁজি বিনিয়োগের স্বচ্ছ ও সরল উপায় উদ্ভাবন; এবং	অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক
৪.	আলুজাত সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্যান্য এগ্রোপ্রসেস পণ্যের ন্যায় নগদ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা।	অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	আলুজাত বিভিন্ন খাদ্য এবং খাদ্য উপকরণ তৈরীতে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান এবং দক্ষ জনবল সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ;	কৃষি মন্ত্রণালয়
২.	ভাতের বিকল্প হিসেবে আলুজাত সামগ্রীর ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ; এবং	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩.	বিপণন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

১.	আলুজাত সামগ্রী উৎপাদনের জন্য উপযোগী জাতের আলুর উদ্ভাবন বা প্রয়োজনে উপযোগী জাতের আলুর আমদানির মাধ্যমে তা চাষের ব্যবস্থাকরণ। আমদানিকৃত আলুর জাত দ্রুত ছাড়করণের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৯.৪ ভেষজ খাদ্যঃ বিশ্বে ভেষজ খাদ্য মূলতঃ ফুড সাপ্লিমেন্ট, ভিটামিন, খাদ্যের সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। এছাড়া বিশ্বে প্রায় সব দেশেই ভেষজ ঔষধ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে ইউনানী, আয়ুর্বেদিক এবং হোমিও ঔষধের মূল কাঁচামাল ভেষজ উদ্ভিদ। ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ভেষজ সামগ্রীর নির্যাস, গুড়া ইত্যাদি ব্যবহার হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রায় ৬৫০ প্রজাতির ঔষধি উদ্ভিদ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ২৫টি প্রজাতির ঔষধি উদ্ভিদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে বিদ্যমান ভেষজ উদ্ভিদের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। এজন্য হার্বাল ফার্মাকপিয়া প্রণয়ন আবশ্যক। বাংলাদেশে ভেষজ উদ্ভিদ ভিত্তিক ফুড সাপ্লিমেন্ট, ভিটামিন তৈরির শিল্প, বিভিন্ন ফুল ও আগর উদ্ভিদ ভিত্তিক পারফিউম শিল্প এবং ঔষধের কাঁচামাল তৈরীর লক্ষ্যে ইন্টারমিডিয়েটারি শিল্প গড়ে উঠতে পারে। বিশ্বে ভেষজ কসমেটিক ও টয়লেট্রিজ এর বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক পণ্য ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে ভেষজ কসমেটিক ও টয়লেট্রিজ শিল্প গড়ে উঠতে পারে। তবে বাংলাদেশে মান সম্পন্ন ভেষজ উদ্ভিদ ঘাটতি দেখা দিয়েছে। দেশে কৃষি কাজে অধিক মাত্রায় অজৈব সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্গানিক মানের ভেষজ উদ্ভিদ প্রাপ্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে প্রাকৃতিক বন উজাড় হতে চলেছে। একসময় প্রাকৃতিক উৎসের ভেষজ উদ্ভিদ দূর্লভ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া কৃষির জন্য অত্যন্ত উপযোগী হওয়ায় বাংলাদেশে ভেষজ উদ্ভিদ চাষের সম্ভাবনা অতি উজ্জল। ভেষজ উদ্ভিদকে দেশের স্বাস্থ্য সেবা, খাদ্য ও প্রসাধণ সামগ্রী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন মান সম্পন্ন উদ্ভিদ এবং এজন্য ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদনে Good Agriculture Practics অনুসরণপূর্বক এর চাষ বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশের কয়েকটি অন্যতম ঔষধ উৎপাদনকারী কোম্পানি বিশেষ করে একমি, স্কয়ার ইত্যাদি কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থায় ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদন করছে। এ খাতের পণ্যাদির মান যথাযথ পর্যায়ে রাখার ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থা উৎসাহিত করা যায়। প্রচলিত অন্যান্য কৃষি পণ্যের ন্যায় ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাজারজাতকরণ মূল সমস্যা। কৃষি পণ্যের প্রচলিত বাজার ব্যবস্থায় এ পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠে নাই। এ সমস্যাটি কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থায় প্রকৃত সমাধান। সরকার কর্তৃক এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হলে বাংলাদেশে ভেষজ উদ্ভিদ ভিত্তিক ছোট বড় অনেক শিল্প গড়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশে তিল, আগর ইত্যাদি ভেষজ সামগ্রী রপ্তানি করে থাকে। তবে এর পরিমান একেবারেই নগন্য। বিশ্বে ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে ভেষজ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানির পরিমান ছিল যথাক্রমে ২৮.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২৮.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ হিসেবে ভেষজ উদ্ভিদ নির্ভর শিল্পের সম্ভাবনা অত্যন্ত ব্যাপক।

৯.৪.১ সমস্যাঃ

১. মান সম্পন্ন কাঁচামালের অভাব;
২. চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থায় কাঁচামাল সংগ্রহের পরিবর্তে এ শিল্পের কাঁচামালের আমদানির প্রবণতা;
৩. ভেষজ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অভাব;
৪. প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা;
৫. ভেষজ মান বিষয়ক টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনসহ ফার্মাকপিয়ার অনুপস্থিতি;
৬. ভেষজ খাদ্য সামগ্রীর সার্টিফায়িং কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট নয়। অন্যান্য খাদ্য পণ্যের সার্টিফায়িং কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট হলেও সার্টিফায়িং প্রতিষ্ঠান ও ল্যবরেটরি এ্যাক্রিডেটেড নয়;
৭. মূলধনের অভাব;
৮. ভেষজ পণ্য পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও সার্টিফিকেশনের জন্য সরকারি বা বেসরকারি খাতে পরীক্ষণ সুবিধার অভাব;
৯. দক্ষ জনবলের অভাব; এবং
১০. বাজার সম্পর্কিত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও বাজার উন্নয়ন কার্যক্রমের অভাব।

৯.৪.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃ নং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	কৃষক থেকে চূড়ান্ত পণ্যের উৎপাদক পর্যায়ে ভেষজ প্রাথমিক পণ্য পৌছানোর উপযোগী বিপণন চ্যানেল তৈরী;	কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
২.	আগামী ৫ বছরের জন্য সব ধরণের আরোপিত ট্র্যাক্স, ভ্যাট, উন্নয়ন সার-চার্জ ইত্যাদি থেকে হারবাল শিল্প খাত-কে অব্যাহতি প্রদান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এ বিশেষ তহবিল গঠন অথবা ইকুইটি এন্টারপ্রিনিয়াম ফান্ড হতে স্বল্প সুদে ঋণ দানের মাধ্যমে এ শিল্প সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ;	অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৩.	ঔষধি উদ্ভিদ উৎপাদনকারীদের জন্য রপ্তানির বিপরীতে আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থাকরণ; এবং	অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৪.	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভেষজ পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদক/ চাষীদেরকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।	অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	বাংলাদেশে ভেষজ ঔষধ ও ভেষজ সামগ্রীর বাণিজ্যিক উপযোগীতা ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে ভেষজ উদ্ভিদের চাষ সম্প্রসারণ এবং ভেষজ শিল্প স্থাপনে উৎসাহিতকরণ;	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ বন বিভাগ ও বিসিএসআইআর।
২.	চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন;	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।
৩.	ভেষজ পণ্যের মান বিষয়ক টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনসহ ফার্মাকপিয়া প্রণয়ন;	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ বন বিভাগ ও ন্যাশনাল হার্বোরিয়াম।
৪.	ভেষজ ঔষধ উৎপাদন ও বিপণন লাইসেন্স, মূল্য ও মান নিয়ন্ত্রণ ডিজিডিএ-এর অধীনে আনয়ন। ভেষজ ঔষধ ব্যতীত অন্যান্য ভেষজ সামগ্রীর মান সনদ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে প্রদান। এসব প্রতিষ্ঠানের এক্রিডিটেশনের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিকরণ; এবং	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদি কার্যক্রম অংশগ্রহণের মাধ্যমে মান সম্পন্ন ভেষজ ঔষধ ও ভেষজ সামগ্রী উৎপাদনে বাংলাদেশের সক্ষমতা সম্পর্কে প্রচারণার ব্যবস্থাকরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

১.	প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক মানসম্পন্ন অর্গানিক ভেষজ উদ্ভিদের উৎপাদন এবং তা ভেষজ শিল্পে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়।

৯.৫ মৎস্যজাত খাদ্যঃ বাংলাদেশে Ready to Eat পর্যায়ের মাছ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প নেই বললেই চলে। কিছু প্রতিষ্ঠান সামান্য পরিমানে Ready to Eat পর্যায়ের প্রক্রিয়াজাত মাছ তৈরি করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে তিনটি ফিস ফিলে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা Ready to Cook পর্যায়ের খাদ্য উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এ ব্যতীত বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেলাপিয়া, পাঙ্গাশ ইত্যাদি প্রসেসিং উপযোগী মাছ চাষ হচ্ছে যা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজারে বিপণনের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় ১ কোটির উপরে বাংলাদেশি মানুষ বিদেশে বসবাস করছেন। একই ধরণের চাহিদার কারণে বিদেশে বসবাসরত ভারত উপমহাদেশীয় জনগোষ্ঠির বাজারেও বাংলাদেশি খাদ্যের বিপণন সম্প্রসারণের সুযোগ বিদ্যমান। বাংলাদেশ হতে বর্তমানে কিছু পরিমানে Ready to Eat পর্যায়ের হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি হচ্ছে। বর্তমান পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে Ready to Cook পর্যায়ে মাছ প্রক্রিয়া করে বিপণন সম্প্রসারণের সুযোগও বিদ্যমান। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে মাছ ক্যানিং শিল্প গড়ে উঠে নাই। টুনাসহ বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ক্যানিং এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণনের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। মাছ প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যাপক পরিমাণে মাছের কাটা ও আঁশ সম্বলিত বর্জ্যের উৎপাদন। উক্ত বর্জ্যের বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্ভব না হলে মাছ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়া আবশ্যক।

হিমায়িত খাদ্য খাতের রপ্তানি আয়ের ৮০% অর্জিত হয় চিংড়ি ও বাকী ২০% অর্জিত হয় অন্যান্য মাছ ও পণ্য হতে। মাছ ও Ready to Cook পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাত মাছের ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৪৩,৩৭৬মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১,৪২,৪০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১,৪৮,৩৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১,৫৫,৬৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১,৪১,৯৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশে বিগত পাঁচ বছরের একই সময়ে Ready to Cook পর্যায়ের হিমায়িত খাদ্য খাতে রপ্তানি আয় হয়েছে ৬৫০.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৫২৫.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৬৩১.৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৬১৫.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৪৯৮.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বে Ready to Eat পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাত মাছের প্রধান প্রধান আমদানিকারক দেশসমূহ হচ্ছে জাপান, ইউকে, ইউএসএ, জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, ইটালী, হংকং, কানাডা, স্পেন ইত্যাদি এবং রপ্তানিকারক দেশসমূহ হচ্ছে চীন, নরওয়ে, ইউএসএ,ভারত, ভিয়েতনাম, কানাডা, চিলি, সুইডেন, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ইউকে ইত্যাদি। বাংলাদেশে সেমিপ্রসেসড মাছের রপ্তানি ও বিশ্ব আমদানির তুলনামূলক তথ্য চিত্র নিম্নে দেখানো হলোঃ

তথ্য চিত্র-০৮

Value in million US$

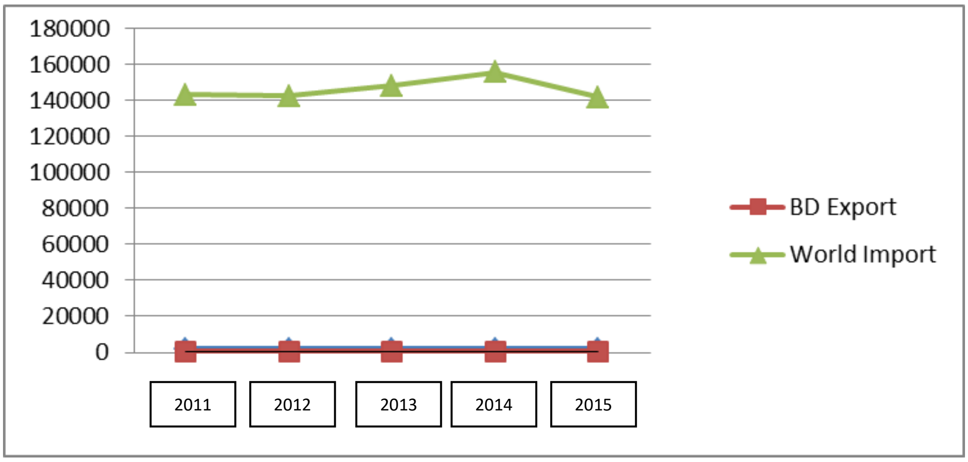

উৎস:রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও আইটিসি ট্রেড ম্যাপ

উপরের তথ্যচিত্রে প্রতিয়মান হয় যে, বাংলাদেশে Ready to Cook এবং Ready to Eat পর্যায়ের মৎস্য শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ Ready to Cook ও টিনজাত বা বিভিন্ন পর্যায়ে Ready to Eat পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানির ব্যাপক সম্ভাবনা বিদ্যমান। ফিস ক্যানিং শিল্প বাংলাদেশে গড়ে উঠতে পারে।

বিশ্বের অনেক দেশে প্রক্রিয়াকরণ ব্যয় বেশী হওয়ায় সরাসরি মাছ প্রক্রিয়াকরণে না গিয়ে By Back Arrangement পদ্ধতিতে কাঁচামাল প্রেরণপূর্বক মাছ প্রসেস করে থাকে। বাংলাদেশী উদ্যোক্তাবৃন্দকে প্রক্রিয়াকরণের এ সুযোগ প্রদান করা হলে দেশে প্রক্রিয়াকরণ কারখানা এমনকি Ready to Eat পর্যায়ের কারখানা গড়ে উঠতে পারে। এতে প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। তবে বাংলাদেশে চাষ হচ্ছে এমন সব মাছের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রদান করা হলে মাছ চাষ সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্থ হতে পারে। এ বিবেচনায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক উৎসে পাওয়া যায় না বা বাংলাদেশে চাষ হয়না এমন প্রজাতির মাছের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রদান করা যায়। এ সুবিধা শুল্ক বন্ড ব্যবস্থাদির আওতায় পরিচালিত হতে পরে।

৯.৫.১ সমস্যাঃ

১. মৎস্য নির্ভর চূড়ান্ত খাদ্য প্রসেসিং শিল্পের অভাব;
২. মৎস্য নির্ভর চূড়ান্ত খাদ্য উৎপাদন প্রযুক্তির অভাব;
৩. By Back Arrangement-এর আওতায় মাছ আমদানি এবং প্রক্রিয়াকরণের পর তা পুনঃরপ্তানি সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও অনুমোদনের অভাব;
৪. দক্ষ জনবলের অভাব;
৫. পুঁজি বিনিয়োগে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনীহা;
৬. পুঁজির উচ্চ সুদহার;
৭. মৎস্য নির্ভর চূড়ান্ত খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মৎস্য বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অভাবে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি;
৮. বাজার চাহিদা সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব; এবং
৯. বিপণন কার্যক্রমের অভাব।

৯.৫.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	মৎস্য নির্ভর চূড়ান্ত খাদ্য প্রসেসিং শিল্প স্থাপন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ট্যাক্স হলিডেসহ বিবিধ আর্থিক সুবিধা প্রদান;	অর্থ মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়
২.	মৎস্য নির্ভর চূড়ান্ত খাদ্য পণ্যের রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তাসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান;	অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৩.	মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহ সার্বক্ষনিক চালু রাখা এবং এসব কারখানার সম্প্রসারণের স্বার্থে বাংলাদেশে যে সব প্রজাতির মাছ উৎপন্ন হয় না সে সব প্রজাতির মাছ আমদানি ও প্রক্রিয়াকরণপূর্বক শতভাগ রপ্তানির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং	মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৪.	প্রাকৃতিক উৎসে পাওয়া যায় না বা বাংলাদেশে চাষ হয়না এমন প্রজাতির মাছের ক্ষেত্রে শুল্ক বন্ড ব্যবস্থাদির আওতায় By Back Arrangement পদ্ধতিতে কাঁচামাল প্রেরণ এবং প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ প্রদান করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

খ)মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	মৎস্যজাত খাদ্য শিল্প স্থাপনে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য সহজে ও স্বল্প সুদে পুঁজির সরবরাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বাংক কর্তৃক বিশেষ তহবিল গঠন;	অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২.	মৎস্যজাত খাদ্য শিল্পের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এর উদ্যোগ গ্রহণ;	মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়
৩.	মৎস্যজাত খাদ্য শিল্পের পণ্য মান ও ট্রেসিবিলিটি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ ফার্মিং ব্যবস্থার কাঁচামাল (মাছ) উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;	মৎস্য অধিদপ্তর
৪.	মান সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সনদ প্রদানের সক্ষমতা যুগোপযোগী ও চাহিদা নির্ভরকরণ এবং মান সনদের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ্যাক্রিডিটেশনের ব্যবস্থাকরণ;	মৎস্য অধিদপ্তর
৫.	খাদ্য মান প্রণয়ন এবং প্রণীত মানে মাছজাত খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ; এবং	বিএসটিআই ও মৎস্য অধিদপ্তর
৬.	মৎস্যজাত খাদ্যের রপ্তানি বিপণন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

১.	দ্রুত বাংলাদেশ সমুদ্রসীমায় মৎস্য সম্পদের প্রজাতির সংখ্যা, প্রাপ্যতা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণের মাধ্যমে টেকসই সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের কৌশল উদ্ভাবন (সামুদ্রিক মাছের)। অব্যাহত সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদানপূর্বক সামুদ্রিক মৎস্যজাত শিল্প স্থাপনে উৎসাহিতকরণ;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
২.	দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এ খাতের চাহিদা নির্ভর দক্ষ জনবল সৃষ্টি। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সিলেবাস পর্যালোচনাপূর্বক যুগোপযোগীকরণ; এবং	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩.	আর্থিক ও অন্যান্য সুবাধাদি প্রদানের মাধ্যমে মৎস্য নির্ভর চূড়ান্ত খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মৎস্য বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাবৃন্দকে উৎসাহিতকরণ।	মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়

৯.৬ সল্টেড ও ডিহাইড্রেড মাছঃ বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে সল্টেড ও ডিহাইড্রেড পর্যায়ে মাছ প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে এবং এ মাছের ব্যাপক পরিমাণে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্য সহায়ক প্রিজারভেটিভ ব্যবহার না করা এবং উন্নত প্যাকিং সামগ্রী ব্যবহৃত না হওয়ায় খাদ্য মান ঠিক রেখে এ পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

৯.৬.১ সমস্যা:

১. খাদ্য মানের অনুপস্থিতি;
২. স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তির অভাব;
৩. গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অভাব;
৪. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় খাদ্য মান বজায় না রাখা;
৫. স্বাস্থ্য সহায়ক প্রিজারভেটিভ ব্যবহার না করা
৬. উন্নত প্যাকেজিং ব্যবস্থার অনুপস্থিতি;
৭. পণ্যের মানগত বাজার চাহিদা সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব; এবং
৮. বিপণন উন্নয়ন কার্যক্রমের অভাব।

৯.৬.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	**করণী**	**বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান**
১.	সল্টেড ও ডিহাইড্রেড মাছ-এর বাংলাদেশ মান প্রণয়ন এবং বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশনের আওতায় প্রণীত মানে পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত নিশ্চিতকরণ; এবং	বিএসটিআই

২.	সল্টেড ও ডিহাইড্রেড আকারে মাছ প্রক্রিয়াকরণে Good Manufacturing Process, HACCP ইত্যাদি অনুসরণ বাধ্যতামূলককরণ।	মৎস্য অধিদপ্তর

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে পণ্যাদি সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত মানের প্যাকেজিং সামগ্রীর উন্নয়ন ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; এবং	বিসিএসআইআর ও মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট
২.	সল্টেড ও ডিহাইড্রেড মাছ বিপণনের ক্ষেত্রে জলাধারের উন্নত পরিবেশ, মাছের স্বাস্থ্যসম্মত আহরণ, স্বাস্থসম্মত ভাবে প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেটজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহণ ইত্যাদি সার্বিক অবস্থার উপর ডকুমেন্টরী তৈরী ও প্রদর্শনের মাধ্যমে ক্রেতা সাধারণের আস্থা অর্জন। বাণিজ্য মেলায় অংশ গ্রহণ ইত্যাদি বাজার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।	মৎস্য অধিদপ্তর ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

গ) দীর্ঘমেয়াদি (০৫ বছর):

১.	সঠিক মানে পণ্যাদি প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য বিজ্ঞান সম্মত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।	মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট

৯.৭ চিনিজাত খাদ্যঃ বাংলাদেশ এবং বিশ্বে অনেক দেশেই চিনি নির্ভর বেশ কিছু খাদ্য তৈরী এবং বিপণন হয়ে থাকে। বাংলাদেশে চিনির ঘাটতি থাকায় এ শিল্পে বাংলাদেশ সুদৃঢ় অবস্থান নিশ্চিতে সক্ষম হবে বলে মনে হয় না। বর্তমানে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং সেমি প্রক্রিয়াকরণকৃত চিনি আমদানি ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করছে। মূল্যজনিত কারণে অনেক সময় বাংলাদেশের চিনি কলে উৎপাদিত চিনি অবিক্রিত অবস্থায় থেকে যায়। এ পর্যায়ে বাংলাদেশে চিনি নির্ভর খাদ্য শিল্পের সম্প্রসারণ মূলতঃ আমদানিকৃত চিনির উপর চিনিজাত খাদ্যের উৎপাদন নির্ভর করবে।

৯.৭.১ সমস্যাঃ

১. বাংলাদেশে আমদানি নির্ভর চিনিজাত পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা বিরাজমান।

৯.৭.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	ব্রাউন চিনি উৎপাদন ও প্যাকেটজাতকরণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	চিনি উপজাত পণ্য যেমন-এ্যালকোহল, স্প্রিট ইত্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

১.	চিনি মিশ্রিত খাদ্য উৎপাদন কারখানা বৃদ্ধিকরণ (চকলেট, ক্যান্ডি, ট্রপি ইত্যাদি।	শিল্প মন্ত্রণালয়

৯.৮ খাবার পানিঃ নদী খালবিলে পরিপূর্ণ বাংলাদেশে বোতলজাত করে পানি বিপণন হবে কিছুদিন পূর্বে তা চিন্তা করা হয় নাই। বর্তমানে বাংলাদেশে খাবার পানি বোতল জাত করে বিপণন একটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে পরিণত হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে বোতলজাতকৃত পানির (এইচএস কোড ২২০১) রপ্তানি মূল্য ছিল ০.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৫ সালে বিশ্বে ৩.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বোতলজাত পানি আমদানি এবং৩.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বোতলজাত পানি রপ্তানি হয়েছে। প্রাকৃতিক সহজ লভ্য হওয়ায় বোতলজাত পানি উৎপাদন ব্যয় মূলত: বিশুদ্ধকরণ, বোতলজাতকরণ এবং ট্রান্সপোর্টেশন বাবদ ব্যয়। এ হিসেবে পানির বিশ্ব বাণিজ্য কিছুটা জটিল। তবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে পানি রপ্তানির সম্ভবনা রয়েছে। ২০১৫ সালে মধ্যপ্রাচ্যে পানি (এইচএস কোড ২২০১) আমদানির মূল্যগত পরিমান ছিল ০.২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এখানে ২৫০ গ্রাম বোতল থেকে ৫ লিটার বোতলের পানি বাজারজাতকরণের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ উক্ত সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। এতে পানির বোতলজাতকরণ শিল্প সম্প্রসারিত হতে পারে।

৯.৮.১ সমস্যাঃ

১. মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মিত মনিটরিং-এর অভাব; এবং
২. যথাযথ পণ্যমানে পানি বোতলজাতকরণে উৎপাদনকারী কিছু প্রতিষ্ঠানের অনীহা।

৯.৮.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	প্রাকৃতিক খনিজ পানি আহরণ ও উন্নত বোতলজাতকরণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	আধুনিক স্টেষ্টিং ল্যাবরেটরীজ স্থাপন ও মান সনদ প্রদান; এবং	শিল্প মন্ত্রণালয়
২.	প্রদত্ত মান সনদে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের ব্যবস্থাকরণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়

৯.৯ মধুঃ বিশ্বের অনেক দেশে মধু একটি অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাধারণত শীতপ্রধান দেশে মধুর চাহিদা বেশি এবং বিশ্বের প্রায় ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মধুর বাৎসরিক চাহিদা রয়েছে। ফল-ফুলে ভরপুর হওয়ায় এদেশ মধু ও অন্যান্য hive product উৎপাদনে সহায়ক। কোন প্রকার antibiotic ব্যবহার ব্যতীত এদেশে মধু চাষ হয় বিধায় আমাদের দেশের মধুর গুণগতমান বিদেশি যে কোন মধুর চেয়ে ভাল। মধু চাষে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে এ পণ্যের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। দেশে এখনো বিদ্যমান মধু চাষ পদ্ধতি অনুন্নত। আধুনিক চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে মধু উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। ১৯৫০ সালে সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলকভাবে সিলেট জেলায় মৌচাষ শুরু হয় যা সে সময় দক্ষ কর্মী ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে সফলতা অর্জন করেনি। ১৯৬০ সালে BSCIC কর্তৃক খুলনা জেলার যাত্রাপুরে wooden hive-এ মৌ-পালন শুরু করা হলেও আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। ১৯৭৭ সালে BSCIC পুণরায় বৈজ্ঞানিক পন্থায় আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় Asiatic honeybee চাষে সাফল্য অর্জন করে যা পরবর্তীতে সারা দেশে বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু ১৯৮৯ সালে মৌ-পালন শিল্প (Asiatic honeybee) sac brood ভাইরাসে আক্রান্ত হলে এ সেক্টরটি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। নব্বই এর দশকে দুইজন মৌচাষী আইয়ুব ও সুনীল পার্শ্ববর্তী দেশের Western Haneybee ও Apic mellifera এর প্রবর্তন ঘটান। ১৯৯২ সালে Proshika নামক একটি এনজিও বিসিক এর সহযোগিতায় Western Haneybee সংগ্রহপূর্বক মৌ-পালন শুরু করে। বাংলাদেশের বর্তমানে Beekeepers welfare Society নামক একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার সদস্য হিসেবে ৫১৭ জন মৌচাষী রয়েছে। যাদের মোট বক্স সংখ্যা বর্তমানে ৪২,৯১১টি। বিসিক এর তথ্য অনুযায়ী ২০১২ সাল পর্যন্ত ২৫,০০০ মৌচাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে এর মধ্যে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে মাত্র ১৫৫১ জন মৌচাষী।

সুন্দরবন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মধুর প্রধান উৎস। এছাড়া অন্যান্য বনাঞ্চলেও মধু পাওয়া যায়। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক মধু এবং চাষের মধু উভয়ের সংগ্রহ পদ্ধতি বলা যায় সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল। এদেশে মধু সংগ্রহে হাইজেনিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। যার কারণে বাংলাদেশি মধুর খাদ্যমান ভালো হলেও গুণগত মান ভালো থাকে না। এ কারণে আমদানিকারক দেশসমূহ বাংলাদেশের মধু Table Honey হিসেবে ব্যবহারের পরিবর্তে বিবিধ শিল্পে ব্যবহার করে যা মূল্য কম হওয়ার কারণ। এছাড়া বিভিন্ন ফুল ফসলে রাসায়নিক সার এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। যার কিছু প্রভাব মধুতে পড়তে পারে। দেশে হাতে গোনা কয়েকটি মধু প্রক্রিয়াকরণ ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা কম। মধুতে সহজেই ভেজাল মিশ্রিত করার সুযোগ রয়েছে যার কারণে ভোক্তা পর্যায়ে বাংলাদেশি মধুর প্রতি আস্থাহীনতা রয়েছে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে মধু আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ।

বাংলাদেশে বছরে মধুর চাহিদা প্রায় ৩০,০০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে দেশে উৎপাদিত হয় প্রায় ৪,০০০ মেট্রিক টন। এ হিসেবে দেশে মধু আমদানির পরিমান প্রায় ২৬,০০০ মেট্রিক টন। বাংলাদেশে থেকে ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মধু রপ্তানির পরিমান যথাক্রমে ০.১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ০.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ০.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১১ হতে ২০১৫ সালে প্রকাশিত তথ্য মতে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমান ছিল যথাক্রমে ১৭১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৭৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২৩২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২৩২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ থেকে মধু রপ্তানি এবং বিশ্বে মধুর মোট আমিদানি সংক্রান্ত তথ্যচিত্র নিম্নে দেয়া হলোঃ

তথ্য চিত্র-০৯

Value in million US$

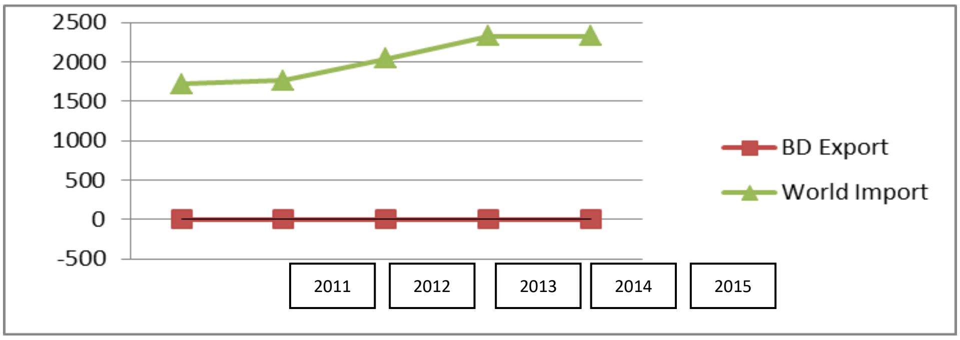

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং আইটিসি ট্রেড ম্যাপ

উপরোক্ত বর্ণনা এবং তথ্য চিত্রে প্রতীয়মান হয় যে, মধুর অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজার বিদ্যমান। দেশে ফুল-ফসলে মানব স্বাস্থ্য সহিষ্ণু পরিমানে রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার নিশ্চিত, স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক ও চাষের মধু সংগ্রহ, মৌচাষে উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার এবং মধু প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশ মধু চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী বিধায় এটি হতে পারে একটি অত্যন্ত উপযোগী খাদ্যখাত যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণপূর্বক উদ্বৃত্ত অংশ রপ্তানির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমান রপ্তানি আয় অর্জিত হতে পারে। এখাতে সফলতার জন্য মৌচাষ বৃদ্ধিকরণসহ বর্ধিত সংখ্যায় প্রসেসিং শিল্পের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। এছাড়া দেশে রয়েল জেলি, প্রপোলিন ও ওয়াক্স-এর উৎপাদন সম্ভাবনা ব্যাপক এবং এসব পণ্যের ব্যাপক রপ্তানি বাজার রয়েছে। প্রাকৃতিক কারণে অনেক দেশে রানী মৌমাছি জন্মায় না। বাংলাদেশ, ভারত, চীন, মায়ানমার রানী মৌমাছির প্রজননের জন্য উপযোগী বিধায় বাংলাদেশ রানী মৌমাছির প্রজনন এবং বিভিন্ন দেশে রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। তবে বাংলাদেশে মৌ চাষের সুষ্ঠু সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মৌমাছির সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত উপযোগী সুযোগ সুবিধাদি সৃষ্টি, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসক এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রের অভাব রয়েছে যা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ ব্যতীত দেশে মধুর সর্বজন গ্রহণযোগ্য মান এবং মান সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মান প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতার কারণেও পণ্যটি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে আস্থা অর্জনে সক্ষম হতে পারছে না। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও মধু এদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আমদানি ব্যয় সাশ্রয় এবং রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়।

৯.৯.১ সমস্যাঃ

১. সরকারি পর্যায়ে মধু উৎপাদন, আহরণ এবং প্রক্রিয়াকরণে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কর্মরত প্রতিষ্ঠান বিসিক-এর এ খাতের সার্বিক (মৌমাছির জাত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সেবা, মধু আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি) উন্নয়নে সক্ষমতার অভাব;
২. মধু পাওয়া যায় এমন ফুল ফসলাদি চাষের ক্ষেত্রে মানব স্বাস্থ্য সহিষ্ণু পরিমানের তুলনায় বেশি পরিমান কীটনাশকসহ অজৈব রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার;
৩. মৌমাছির স্বাস্থ্য সুরক্ষা, রোগ-বালাই দমন এবং জাত উন্নয়ন প্রযুক্তি ইত্যাদি ব্যবস্থাদির অভাব;
৪. সংগৃহীত মধু প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি ও শিল্পের অভাব;
৫. গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অভাব;
৬. দেশে মধুর সর্বজন গ্রহণযোগ্য মান এবং মান সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অভাব;
৭. বাধ্যতামূলক মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার অভাব; এবং
৮. মধুর বিবিধ উপ-জাত তৈরী সংক্রান্ত প্রযুক্তি, দক্ষ জনবল, শিল্প এবং বিপণন উদ্যোগের অভাব।

৯.৯.২ করণীয়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	মৌচাষে জড়িত মৌ চাষী ও মোওয়ালীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান;	বিসিক ও প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর
২.	মৌচাষের উপযোগী হাল্কা সহায়ক যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে মৌচাষী তৈরী এবং স্বল্প সুদে মূলধন সরবরাহ ও বিপণন উন্নয়নের মাধ্যমে মৌচাষে উদ্বুদ্বকরণ;	বিসিক ও প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর
৩.	মৌ চাষ ও মধু আহরণ প্রক্রিয়া আধুনিকীকরণে সহায়তা প্রদান; এবং	শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিসিক

৪.	মধুর বাংলাদেশে মান নির্ধারণ এবং নির্ধারিত মানে মধু বাজারজাত করণের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ।	শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিসিক

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	ভাল জাতের রানী মৌমাছি উৎপাদনের জন্য প্রজনন কেন্দ্র সৃষ্টি, মৌমাছির স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, মধু চাষ সম্প্রসারণ, উন্নত মান সম্পন্ন পদ্ধতিতে মধু আহরণ, মধু প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণন উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ;	প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর
২.	মধুর সর্বজন গ্রহণীয় বাংলাদেশ মান প্রণয়ন এবং বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশনের আওতায় প্রণীত মানে মধুর অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিপণন নিশ্চিতকরণ;	বিএসটিআই
৩.	মৌমাছির জাত উন্নয়ন, মধু সংগ্রহ ব্যবস্থাপনাসহ সার্বিক বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা;	প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর
৪.	মৌচাষ ও মধু প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদান;	বিসিক, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর ও অর্থ মন্ত্রণালয়
৫.	পর্যায়ক্রমে মধুর আমদানির উপর শুল্ক-কর বৃদ্ধিকরণ এবং শেষ পর্যায়ে মধু আমদানি নিষিদ্ধকরণ; এবং	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সিসিআইএন্ডই এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৬.	মধুর অভ্যন্তরীণ বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাজার উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।	বিসিক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

১০. শিল্প পর্যায়ে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতের সমস্যা ও করণীয়ঃ

বাংলাদেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প অত্যন্ত সম্ভাবনাময় হলেও এ শিল্পের বিকাশে ব্যাপক সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। খাদ্যের কাঁচামাল উৎপাদনে প্রি ও পোষ্ট হার্ভেষ্টিং পর্যায়ে দুর্বলতা, মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের সম্পৃক্ততা, খাদ্য শিল্পের বিনিয়োগ, খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এ দুর্বলতা বিদ্যমান। এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ আবশ্যক।

খাদ্যশিল্পে নিরাপদ সংরক্ষণ এবং নিরাপদ পরিবহন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়টি নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজন উন্নত প্যাকেজিং সামগ্রী। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান একেবারেই নিম্নপর্যায়। শুধুমাত্র ফিনিশড খাদ্যের জন্য প্যাকেজিং আবশ্যক এমনটা নয়, খাদ্যের কাঁচামাল ও উপকরণাদির জন্যও উন্নত প্যাকেজিং সামগ্রী দরকার। এ প্যাকেজিং সামগ্রী আবশ্যিকভাবে ফুড গ্রেডেড হতে হবে। দেশে খাদ্যের ক্যানিং এর সম্ভাবনাও ব্যাপক। এজন্য ক্যানিং শিল্প থাকা আবশ্যক। উন্নত মানের খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতের জন্য উন্নত মানের কাঁচামাল এবং কাঁচামাল উৎপাদনে ব্যবহৃত মান সম্পন্ন পশ্চাৎ সংযোগ সামগ্রী আবশ্যক। এসব বিষয় নিশ্চিত করার জন্য কৃষি সামগ্রী উৎপাদনে/পালনে উন্নত মানের বীজ/পোনা, মানসম্পন্ন খাদ্য/সার, ঔষধপত্র ইত্যাদি প্রয়োজন পড়ে যা খাদ্যের সহায়ক শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায়। খাদ্য খাতের এসব সহায়ক শিল্পের মধ্যে মৎস্য, পোল্ট্রি, ডেইরী ইত্যাদির খাদ্য শিল্প, প্রাণীজ বর্জ্য ও উপজাত ভিত্তিক শিল্প, হ্যাচারী, বরফকল ইত্যাদি অন্যতম। মানসম্পন্ন খাদ্য শিল্পের সম্প্রসারণের জন্যও এসব শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এসব শিল্পজাত পণ্যের মানগত অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল এবং মূল্য অনিয়ন্ত্রিত। তাই এসব শিল্পে উৎপাদিত পণ্যাদি মান ও মূল্য উভয়ই নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। কৃষি প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য শিল্পের সুষম উন্নয়নে এসব বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান কিছু খাদ্য শিল্প বর্তমান মান এবং পরিমানগত চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। খাদ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সাথে সংগতি আনয়নের জন্য Balancing, Modernization, Rehabiliation and Expansion (BMRE) এর প্রয়োজন হতে পারে। BMRE সম্পাদনের ক্ষেত্রে শিল্প মালিক এবং সরকারকে যৌথভাবে কাজ করা দরকার।

বর্তমান বিশ্বে খাদ্য বিপণনে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে ধর্মীয় চাহিদা ভিত্তিক খাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন উদ্যোগ গ্রহণ অন্যতম। এজন্য বর্তমান সময়ে হালাল খাদ্যের বিশ্বব্যাপি চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হালাল বাজারে অবস্থান নেই বললেই চলে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে হালাল বাজারে প্রবেশ করার। বাংলাদেশ থেকে হালাল খাদ্য রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা খুব ধীর গতিতে অগ্রসরমান। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক হালাল সার্টিফিকেশন প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এখনও এর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয় নাই। দেশে হালাল আয় তৈরী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া হালাল নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগের দ্রুত বাস্তবায়ন আবশ্যক।

বাংলাদেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়। খাদ্যের মান সুনিশ্চিতকরণসহ বিবিধ বিষয় দেখা-শুনার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান অথবা সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু খাদ্য শিল্পের সম্প্রসারণে নিবিড়ভাবে কার্যাদি পরিচালনার জন্য পৃথক বিশেষায়িত সংস্থা থাকার বিষয়টি এখনও সেভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে না যা বিবেচনা করা আবশ্যক। BCSIR-এর Food Science and Technology বিভাগ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করলেও তা পরিপূর্ণ নয়। এক্ষেত্রে সংস্থাটির Food Science and Technology বিভাগ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান যুক্তিযুক্ত হতে পারে। খাদ্য শিল্পের সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনায় এখাতে বিদ্যমান দুর্বলতাসমূহ নিম্নে দেখানো হলোঃ

১০.১ শিল্প পর্যায়ে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতে বিদ্যমান সমস্যাঃ

১০.১.১ কাঁচামাল পর্যায়েঃ

১. বাংলাদেশের কৃষকগণ নিজ চাহিদা সামনে রেখে কৃষি পণ্য উৎপাদন করে থাকে। লাভ-ক্ষতিকর বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে উপযোগী কৃষি পণ্য উৎপাদনের পরিবর্তে গতানুগতিক কৃষি পণ্য উৎপাদনের কারণে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের চাহিদা উপযোগী কাঁচামালের অভাব;

২. কৃষিজ পণ্যের অনুন্নত মান এবং উচ্চ মূল্য;

৩. উচ্চ ফলনশীল জাতের কৃষি পণ্যের অনুপস্থিতি এবং কম উৎপাদনশীলতার কারণে কাঁচামালের মূল্য বেশী হওয়ায় বাংলাদেশে উৎপাদিত খাদ্য মূল্য বিশ্ব বাজারে অপ্রতিযোগী;

৪. কিছু কিছু কৃষি পণ্যে মাত্রাতিরিক্ত বিবিধ রাসায়নিকের উপস্থিতির কারণে চূড়ান্ত খাদ্য পণ্যে রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি;

৫. চূড়ান্ত খাদ্য পণ্যের উৎপাদক, ইন্টারমিডিয়েটরি পণ্যের উৎপাদক এবং কৃষকদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার অভাবে মানহীন কাঁচামাল মান সম্পন্ন খাদ্য উৎপাদনের অন্তরায়;

৬. মান সম্পন্ন কৃষি পণ্য উৎপাদন, ফসল কর্তন/সংগ্রহ, পরিবহন, সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কৃষকবৃন্দের কারিগরি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা যা চূড়ান্ত খাদ্য পণ্যের মান ও মূল্য অপ্রতিযোগিতার অন্তরায়;

৭. রেফার ভ্যান, রেফার ট্রাক, রেফার কন্টেইনার এর উপর উচ্চ শুল্ক ও কর বিদ্যমান থাকায় ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারণে খাদ্য পণ্যের কুল চেইন পরিবহন নিশ্চিতকরণের অন্তরায়;

৮. বৈজ্ঞানিক তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে পরিবেশ আইন প্রণীত না হওয়ায় অনেক কৃষিজ পণ্য এবং উক্ত কৃষি পণ্যভিত্তিক খাদ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি আইনগত কারণে বাঁধার সম্মূখীন;

৯. কাঁকড়া প্রসেসিং কারখানার ঘাটতি থাকা সত্বেও অলসভাবে বসে থাকা চিড়িং প্রসেসিং কারখানায় কাঁকড়া প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধি নিষেধ প্রক্রিয়াজাত কাঁকড়া উৎপাদনের অন্তরায়;

১০. অপ্রচলিত কৃষি পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কৃষকদের অজ্ঞতা এবং এসব কৃষি পণ্যের চাষ সম্প্রসারণে সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিষ্ক্রিয়তা যা অপ্রচলিত কৃষি পণ্যভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে সম্প্রসারণের অন্তরায়;

১১. বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় মৎস্য সম্পদের সংখ্যা, পরিমান ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যের অভাবসহ গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সক্ষমতার অভাব যা সামুদ্রিক কাঁচামাল ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সম্প্রসারণের অন্তরায়; এবং

১২. মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে 'পরিবেশ ও জলজ সম্পদ' উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ধীরগতি।

১০.১.২ খাদ্য উৎপাদন ও বিপণন পর্যায়ঃ

১. দেশে মান সম্পন্ন খাদ্য শিল্পের এর সংখ্যা সীমিত;

২. দেশের কম্পোজিট ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ এর অভাব;

৩. মানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন এবং দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ উপযোগী করার ক্ষেত্রে দেশের ক্ষুদ্র খাদ্য কারখানাসমূহের সক্ষমতার অভাব;

৪. শস্যজাতও দ্রব্য হতে প্যাকেটজাত অবস্থায় তাৎক্ষণিক ভাবে খাওয়ার উপযোগী খাদ্য উৎপাদন প্রযুক্তির অভাব;

৫. দেশে খাদ্য শিল্পসহ যে কোন শিল্প স্থাপনে Cost of Capital খুব বেশি;

৬. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ইকুইটি ইন্টারপ্রিনিয়ারশিপ ফান্ড ব্যবহারে বিবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে খাদ্য শিল্পসহ এগ্রোপ্রোসেসড পণ্য খাত অলাভজনক;

৭. অধিকাংশ খাদ্য শিল্পে বর্জ্য প্রত্রিয়াকরণ সুবিধা না থাকা খাদ্যমূল্য প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায়;

৮. শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি, অবকাঠামোগত, গ্যাস-বিদ্যুৎ সুবিধা সম্পন্ন ভূমির অভাব;

৯. প্যাকেটজাত অবস্থায় বিপণনযোগ্য সম্পূরক খাদ্যের উৎপাদন সীমিত;

১০. বাংলদেশের উৎপাদিত খাবারের মান, মূল্য, স্বাদ, পুষ্টিমান ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিচিতির অভাব;

১১. পোল্ট্রি, ডেইরী ও বিবিধ জলজ খাদ্যের মূল্য অপ্রতিযোগী;

১২. ভেষজ খাদ্য সামগ্রী সার্টিফায়িং কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট নয়। অন্যান্য খাদ্যে সার্টিফায়িং কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট হলেও সার্টিফায়িং প্রতিষ্ঠান ও ল্যাবরেটরি এ্যাক্রিডিটেড নয়;

১৩. গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অভাব;

১৪. গবেষণা এবং উদ্যোক্তাবৃন্দের আস্থাহীনতার কারণে গবেষণালব্দ ফলাফলের বাণিজ্যিকীকরণ সমস্যা এবং এক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালার অভাব;
১৫. বয়স ভিত্তিক সুষম খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অভাব;
১৬. স্বাস্থ্য সহায়ক প্রিজারভেটিভ ব্যবহারের পরিবর্তে অনেক উৎপাদক কর্তৃক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রিজারভেটিভ এর ব্যবহার;
১৭. খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের মানগত অবস্থা সম্পর্কে খাদ্য উৎপাদকদের অজ্ঞতা;
১৮. অনেক খাদ্য পণ্যের বিডিএস মান অনির্ধারিত হওয়ায় উৎপাদকবৃন্দ খাদ্যের পুষ্টি মান সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে অক্ষম;
১৯. উন্নত উপযোগী মানের প্যাকেজিং সামগ্রীর অভাব;
২০. দেশে Ready to Eat পর্যায়ের খাদ্যের বাজার সীমিত;
২১. আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যের বিপণন উন্নয়ন কার্যক্রম ও ব্যয় উভয়ই সীমিত;
২২. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য উৎপাদন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার অভাব;
২৩. অনুন্নত উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, পরিবহন, প্যাকেজিং এবং সংরক্ষণ অবকাঠামোর দুর্বলতা এবং উৎপাদকদের উদাসীনতা;
২৪. খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ সংরক্ষণ, প্যাকেজিং ও পরিবহন সম্পর্কে উদাসিনতা;
২৫. খাদ্য উপাদান হিসেবে শস্য, তাজা শাক-সব্জি, পোল্ট্রি ও ডেইরী এবং ফিশারিজ পণ্যের দুর্বল মান নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর কারণে বিশ্বে বাংলাদেশী খাদ্যের নেগেটিভ প্রচারণা;
২৬. রপ্তানি বাজারে খাদ্যের নিজস্ব মানের গ্রহণযোগ্যতা ও মান সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার অভাব;
২৭. খাদ্য সামগ্রীর রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্যের মান সনদ প্রদানকারী সরকার স্বীকৃত একাধিক প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি এবং কিছু কিছু পণ্যের মান সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি;
২৮. ক্রেতা দেশের আস্থাহীনতা; এবং
২৯. দুর্বল বিপণন উন্নয়ন কার্যক্রমের অভাব।

১০.২ শিল্প পর্যায়ে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতের বিকাশে করণীয়ঃ

১০.২.১ প্রাথমিক ও সেমি-প্রসেসড্ কৃষি পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	খাদ্যের মান সম্পন্ন কাঁচামালের (কৃষিজ পণ্য) উৎপাদন ও যোগান নিশ্চিতকরণে ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তণ। পণ্য উৎপাদনে চুক্তিবদ্ধ কৃষককে ডিএই এর তরফ থেকে কারিগরি সহায়তা, উপকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীর সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থা ডিএই এর তরফ থেকে মনিটরিং ব্যবস্থাকরণ;	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২.	প্রাথমিক সকল কৃষি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত খাদ্য/রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও অন্যান্য অজৈব সামগ্রীর গুনগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এসব পণ্যের BDS মান নির্ধারণ, BDS মানে পণ্য উৎপাদন/আমদানি এবং বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশনের আওতায় ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে চূড়ান্ত খাদ্য পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ;	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৩.	খাদ্যের মূল্য প্রতিযোগিতামূলক করার ক্ষেত্রে Cool Chain Transpotation, উন্নত প্যাকেজিং এবং নিরাপদ সংরক্ষণ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাজা কৃষি পণ্যের ওজন ঘাটতি ও অপচয় এর পরিমান হ্রাসকরণপূর্বক পোষ্ট হার্ভেষ্টিং লস কমানো এবং পণ্যের মান ঠিক রাখা;	মৎস্য ও প্রাণিম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর
৪.	মান সম্পূন্ন প্যাকেজিং এবং উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতের মাধ্যমে খাদ্যের কৃষিজ কাঁচামালের মান সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে খাদ্যের উন্নত মানের নিশ্চয়তা বিধান; এবং	শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিনিয়োগ বোর্ড
৫.	চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে খাদ্যের ট্রেসিবিলিটি নিশ্চিতকরণ এবং সুষ্ঠু বিপণন চেইন গড়ে তোলার মাধ্যমে পণ্যের সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল প্রাথমিক কৃষি পণ্যের উন্নত বীজ সরবরাহ, একর প্রতি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মান উন্নয়ন এবং খাদ্য শিল্পের চাহিদা উপযোগী Good Agricultural Practice অনুসরণপূর্বক উৎপাদিত কাঁচামালের (কৃষিজ পণ্যের) সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;	কৃষি মন্ত্রণালয়

২.	নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ নীতিমালার ভিত্তিতে শুধুমাত্র খাদ্য শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী শুল্ক মুক্ত রেফার ভ্যান, রেফার ট্রাক ও রেফার কন্টেইনার আমদানির সুযোগ দান;	অর্থ মন্ত্রণালয়
৩.	মানসম্পন্ন খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন নিশ্চিতের মাধ্যমে খাদ্য শিল্পের আন্তর্জাতিক বাজারে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নগদ সহায়তার পরিবর্তে সমপরিমান অর্থ চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ ব্যবস্থা জড়িত কৃষককে বীজ, সার, কীটনাশক ও অন্যান্য উপকরণ এবং কারিগরি সুবিধা ইত্যাদি আকারে প্রদান;	কৃষি মন্ত্রণালয়
৪.	কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রি ও পোষ্ট হার্ভেষ্টিং পর্যায়ের ধাপসমূহসহ কৃষি কাজের ক্ষতিকারক উপাদান ব্যবহারের ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে এবং কৃষিসহায়ক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও সেসব মেনে চলতে কৃষকদেরকে আগ্রহী করে চূড়ান্ত খাদ্যের মান নিশ্চিতকরণ;	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৫.	পশুর নাড়ীভুড়িসহ খাদ্য শিল্পের বজ্য থেকে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রীর বাংলাদেশ মান নির্ধারণ এবং নির্ধারিত মানের স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;	মৎস্য ওপ্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সমিতি
৬.	কাঁকড়ার কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ক গবেষণা জোরদারকরণ, সফ্ট ক্রাবস এর উৎপাদন সম্পসারণ ও প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিবেশ আইনের আওতায় সুইমিং ক্রাবস রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার;	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তর
৭.	দ্রুত বাংলাদেশ সমুদ্রসীমায় বিদ্যমান মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা, পরিমান এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাদ্য শিল্প স্থাপনে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীবৃন্দকে উৎসাহিতকরণ; এবং	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তর
৮.	মৌ পালন এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে মধু সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্বাস্থসন্মত সংগ্রহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মধু প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে কাঁচামালের যোগান নিশ্চিতকরণ এবং শিল্প স্থাপনে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাবৃন্দকে উৎসাহিত করণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

১.	বাংলাদেশে বিদ্যমান পাথরের হলারযুক্ত সকল চাল কলকে রাবার হলারযুক্ত চাল কলে রূপান্তরের ব্যবস্থাকরণ।	বিটাক ও শিল্প মন্ত্রণালয়

১০.২.২ উৎপাদন সুবিধাদি সৃষ্টি সংক্রান্তঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ এ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক খাত হিসেবে চিহ্নিত করে এগ্রোপ্রসেসড পণ্য খাতকে কতিপয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এসব সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করে খাদ্য শিল্পের রপ্তানি সম্প্রসারণ; এবং	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়
২.	খাদ্য উৎপাদন, প্রসেসিং, ট্রান্সপোর্টেশন, স্বাস্থ্যগত বিষয়াদি,কর্মপরিবেশ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে Good Agricultural Practice এর নীতিসমূহ অনুসরণ এবং বাংলাদেশ সরকারের নিরাপদ খাদ্য আইন বাস্তবায়নে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও প্রক্রিয়াজাতকারীদেরকে উৎসাহিতকরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	নাটোর ও নীলফামারী অর্থনৈতিক জোনের ন্যায় পার্বত্য চট্রগ্রাম জেলাত্রয়ের যে কোন একটির বর্ডারে চট্রগ্রাম জেলা সংলগ্ন সুবিধাজনক এক বা একাধিক স্থানে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসমূহের কৃষি পণ্য সংগ্রহ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থাগ্রহণ;	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন অথরিটি
২.	বিদ্যমান খাদ্য শিল্পে উৎপাদিত পণ্যাদির মান বাজার উপযোগীকরণ এবং পণ্য মূল্য প্রতিযোগীতামূলক করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে BMRE করা যেতে পারে; এবং	শিল্প মন্ত্রণালয়
৩.	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।	বিসিএসআইআর

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

১.	অভ্যন্তরীণ ও আন্তজাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বিবিধ কৃষিজ কাঁচামাল নির্ভর খাদ্য উৎপাদন, বিদ্যমান খাদ্যের মানগত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আরএন্ডডি কার্যক্রম গ্রহণ, প্রাপ্ত ফলাফলের বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা যাচাই এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর;	কৃষি মন্ত্রণালয়
২.	বাংলাদেশের যে সব এলাকায় খাদ্য শস্য, পোল্ট্রি, ডেইরী, ফিসারিজ এবং শাক-শব্জি পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হয় সে সব এলাকায় কম্পোজিট ফুড ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলা যায়। এরূপ ইন্ডাষ্ট্রিজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদোক্তা, ব্যাংক, ফুড টেকনোলজিষ্ট ইত্যাদি সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে সম্ভাবনা যাচাই-এর জন্য জাতীয় পর্যায়ে কমিটি গঠিত হতে পারে। এ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে শিল্প স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণে উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীবৃন্দকে উৎসাহিত করা যায়। এতে শিল্প স্থাপণের পর পরেই রুগ্ন শিল্প হিসেবে ঘোষিত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পেতে পারে। এরূপ খাদ্যের অভ্যন্তরীণ বাজার সীমিত হওয়ায় উন্নত দেশের খাদ্য মান অনুসরণের সক্ষমতা সম্পন্ন শিল্প স্থাপন যৌক্তিক হতে পারে; এবং	শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিনিয়োগ বোর্ড
৩.	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্প্রসারণসহ সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য সহায়ক সংস্থা সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে। বিসিএসআইআর-এর খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগকে এ দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। এ দায়িত্ব পালনে জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আর্থিক ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিসিএসআইআর

১০.২.৩ খাদ্যমান সংক্রান্তঃ

গ) স্বল্প মেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	বাংলাদেশের খাদ্য মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ কর্তৃক একই পণ্যের বিভিন্ন মান বিবেচনাপূর্বক মনিটরিং করার কারণে সৃষ্ট সমস্যা দূরীকরণার্থে খাদ্যের মানগত বিধি বিধানে সংগতি আনয়ন এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিপণনের ক্ষেত্রে প্রতিটি খাদ্যের একই মান অনুসরণ করার ব্যবস্থাকরণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	সরকারের মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস্ এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটউশন (বিএসটিআই) ১৫৪ টি শিল্প পণ্য ও প্যাকেটজাত খাদ্য পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে; যার মধ্যে মাত্র ৫৮ টি প্যাকেটজাত খাদ্য পণ্য রয়েছে। এই ৫৮ টি খাদ্য পণ্য ব্যতীত আরও অনেক প্যাকেটজাত এবং প্যাকেটজাত নয় এমন খাদ্য পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। এ ব্যতীত খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদান (কাঁচামাল) এবং উপাদান (কাঁচামাল) উৎপাদনে ব্যবহৃত ঔষধ, কীটনাশক ও রাসায়নিক দ্রব্যদির স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। যা নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। খাদ্যসহ এসব সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণের জন্য USFDA-এর ন্যায় বাংলাদেশে Food and Drug Authority সৃষ্টি;	শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২.	সরকারের মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটউশন (বিএসটিআই) ১৫৪ টি শিল্প পণ্য ও প্যাকেটজাত খাদ্য পণ্যের মান নিশ্চিত করে থাকে; যার মধ্যে মাত্র ৫৮ টি প্যাকেটজাত খাদ্য পণ্য রয়েছে। এ ৫৮ টি খাদ্য পণ্য ব্যতীত আরও অনেক প্যাকেটজাত এবং প্যাকেটজাত নয় এমন খাদ্য পণ্যসমূহের মাননিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশনের আওতায় আনয়ন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৩.	বাংলাদেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত যে সব খাদ্য পণ্যের বাংলাদেশ মান নির্ধারিত নেই সেসব খাদ্য পণ্যের বাংলাদেশ মান নির্ধারণ। বিদ্যমান খাদ্য পণ্যের বাংলাদেশ মানসহ সকল খাদ্য মানসমূহকে ISO 22000:2005, Food Safety System Certification (FSSC) 22000, British Retail Consortium (BRC) Standard, Safe Quality Food (SQF), Global Food Safety Initiative (GFSI) ইত্যাদির সাথে এ্যাক্রিডেটেড করতে হবে। সকল খাদ্য পণ্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণনের ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদনকারী,	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড এবং রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান

	আমদানিপূর্বক অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণনকারী ও রপ্তানিকারককে ISO 22000:2005, HACCP, Traceability, GMP, GAP ইত্যাদি নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক করতে হবে;	
৪.	বাধ্যতামূলক ভাবে HACCP এবং GMP অনুসরণপূর্বক খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাকরণ। মনিটরিং-এ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের চাহিদা ভিত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান
৫.	বাংলাদেশী খাদ্যের নিজস্ব মানের গ্রহণযোগ্যতা ও মান সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। মান নিয়ন্ত্রণ ও সার্টিফিকেশনে ব্যবহৃত ল্যাবরেটরির অপ্রতুলতা দূরীকরণার্থে দেশের সংশ্লিষ্ট সকল ল্যাবরেটরির ডাটাবেজ তৈরী, এ্যাক্রিডিটেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এমওইউ সম্পাদনের মাধ্যমে মান সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুন ভাবে ল্যাবরেটরী না করেই বিদ্যমান পরীক্ষণ ল্যাবরেটরীসমূহ ব্যবহার সুনিশ্চিতকরণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড

১০.২.৪ খাদ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিপণন উন্নয়ন সংশ্লিষ্টঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী সংরক্ষণ ও বিপণনের ক্ষেত্রে Food graded উন্নত প্যাকেজিং শিল্পের অবশ্যকীয়তা বিবেচনায় প্যাকেজিং শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ। প্রয়োজনে Reuseble Food Graded প্যাকিং সামগ্রী ও কন্টেইনারের আমদানি সরলীকরণ ও স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে Food Graded প্যাকেজিং সামগ্রীর সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	শুল্ক আইন, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি আইন, আমদানি নীতি আদেশ ইত্যাদি বিধি-বিধানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিবর্ধণপূর্বক নিজস্ব ব্রান্ডে খাদ্য পণ্যাদি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ব্রান্ড উন্নয়নে উৎসাহিতকরণ;	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
২.	বিশ্বব্যাপি বিদ্যমান হালাল খাদ্যের বাজারে প্রবেশের লক্ষ্যে দ্রুত হালাল আইন তৈরী এবং হালাল নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ল্যাবরেটরীসমূহের সাথে MOU সম্পাদনের মাধ্যমে মান নিশ্চিতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির মান সনদ প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং	ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৩.	বর্হিঃবিশ্বে বাংলাদেশী খাদ্যের গুণগত মান সম্পর্কে প্রচারের ব্যবস্থাকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী খাদ্যের বিপণন উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

১০.২.৫ আর্থিক সুবিধা সংশ্লিষ্টঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য ইকুইটি এন্টারপ্রিনিয়ারশীপ তহবিল হতে ঋণ দান ও তহবিলের রিকভারি অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক তহবিল ব্যবহারের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং উপযুক্ত নীতিমালার আওতায় সরল ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় তহবিল ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ;	কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক
২.	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অনুকূলে ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রদান, সর্বোচ্চ ৮% সুদ হারে ও বিনা শুল্কে মূলধনি যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির সুযোগ প্রদান, সর্বোচ্চ ৫% সুদ হারে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সরবরাহ ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা প্রদান; এবং	অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩.	কর্পোরেট ট্যাক্স ৩৫% হতে ২০% নির্ধারণ।	অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	অতি ক্ষুদ্র ও মাঝারী পর্যায়ের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ব্যাংক ঋণ প্রদান সহজীকরণ এবং এসব শিল্পে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রীর মান সনদ সংগ্রহ, মান উন্নয়ন এবং উৎপাদিত খাদ্য বিপণনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান; এবং	অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

২.	অতি ক্ষুদ্র ও মাঝারী পর্যায়ের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে উৎপাদিত খাদ্যের উপর আরোপিত ভ্যাট ও ট্যাক্স হ্রাসকরণ।	অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এনবিআর

১০.২.৬ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সংশ্লিষ্টঃ

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	দেশের সকল অঞ্চল হতে দ্রুত ও উন্নত মানের কাঁচামাল সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ প্যাকেজিং, পরিবহন ও বিপণনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উন্নত অবকাঠামো সৃষ্টি।	কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও এনবিআর

১০.২.৭ শুল্ক ও অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা সংশ্লিষ্টঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ যথা সৌদি আরব, কুয়েত, কাতারসহ অন্যান্য দেশ ঘনঘন তাদের খাদ্য পণ্য আমদানি আইন ও নীতিমালা পরিবর্তন করে থাকে। দ্রুত পরিবর্তিত আইন ও নীতিমালা বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ এবং দেশের বিধি-বিধানগত বিষয়াদি পরিবর্তিত চাহিদা পূরণ উপযোগী করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	খাদ্য সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান যাবতীয় শুল্ক ও অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে হ্রাসকরণ/দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
২.	মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও বিশ্বের উন্নত দেশসমুহের ভিসা প্রাপ্তিতে জটিলতার কারণে রপ্তানি বিপণনে প্রতিবন্ধকতা তৈরী হচ্ছে। সকল দেশের ভিসা প্রাপ্তি সহজীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
৩.	খাদ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে মানসহ খাদ্য বিপণণের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ, আইন কানুন, বিপণন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড

১০.২.৮ অন্যান্যঃ

ক) স্বল্পমেয়াদি (০১ বছর):

ক্রঃনং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
১.	কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের রপ্তানি তথ্যভান্ডার স্থাপন এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশী খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও রপ্তানি সম্প্রসারণ;	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
২.	লি, আচার, মধু উৎপাদন সংক্রান্ত কারখানায় পরিবেশ দুষণ করার মত কোন পদার্থ ব্যবহৃত না হলে বা উৎপাদিত না হলে Effluent Treatment Plant (ETP) রাখার এবং নতুন শিল্প স্থাপনে ETP থাকার বাধ্যবাধকতা সংশ্লিষ্ট শর্ত প্রত্যাহারকরণ; এবং	বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং শিল্প মন্ত্রণালয়
৩.	বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে উৎপাদিত খাদ্য পরিবেশন এবং ডকুমেন্টরী বিভিন্ন উপায়ে প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

খ) মধ্যমেয়াদি (০৩ বছর):

১.	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সহায়ক শিল্প হিসেবে দেশে মানসম্পন্ন প্যাকেজিং শিল্প, বরফ কল, হিমাগার, প্রাণীজ বর্জ্য ভিত্তিক শিল্প, প্লাস্টিক কন্টেইনার শিল্প ইত্যাদি কৃষি প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য সহায়ক শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ তহবিল সৃজন এবং উপযুক্ত নীতিমালার মাধ্যমে স্বল্প সুদে সরল প্রক্রিয়ায় তা ব্যবহার।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়।

গ) দীর্ঘ মেয়াদি (০৫ বছর):

১.	কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে খাতের চাহিদা উপযোগী আধুনিক মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রর্বতন।	কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়

১১. উপসংহারঃ

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশ মূলতঃ নির্ভর করে বাজার চাহিদা, মান সম্পন্ন কাঁচামালের সরবরাহ, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, প্রতিযোগিতাপূর্ণ মূল্য, উদ্যমী বিপণন ইত্যাদি বিষয়ের উপর। খাদ্যের মৌলিক কাঁচামাল কৃষিজ সামগ্রী। কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের কাঁচামাল বিদ্যমান। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প শ্রমঘন বিধায় পণ্য মূল্য কে প্রতিযোগিতামূলক করবে। এসব কারণে বাংলাদেশে এ শিল্প বিকাশের অত্যন্ত সহায়ক হয়। তবে কাঁচামালের মানগত দুর্বল অবস্থা, বাংলাদেশী পণ্য মান এবং পরীক্ষণ ল্যাবরেটরীর গ্রহণযোগ্যতার অভাবে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশ কিছুটা বাঁধাগ্রস্থ হলেও দেশে এবং দেশের বাইরে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ইমেজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ব্রান্ডে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য বিপণন করছে। সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রয়াসে দেশে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের যুগপোযোগী বিধি-বিধান প্রণয়ন এবং সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশ তরান্বিত করবে বলে আশা করা যায়। খাদ্যের ক্রমবর্ধনশীল রপ্তানি বাজার এ শিল্পের বিকাশে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।